মাসিক
আত-তাহরীক

১৪তম বর্ষঃ ৮ম সংখ্যা

সূচীপত্র

✡ **সম্পাদকীয়** ০২
✡ **প্রবন্ধ :**
❑ পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী *(২৫/১১ কিস্তি)* ০৩
- মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
❑ ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ ১৪
- শিহাবুদ্দীন আহমাদ
❑ পুনরুত্থান ১৭
-রফীক আহমাদ
❑ মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান *(২য় কিস্তি)* ২১
-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ
❑ ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস
-শেখ আব্দুছ ছামাদ ২৫
✡ **অর্থনীতির পাতা :** ২৭
♦ **ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা**
-ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান
✡ **মহিলা ছাহাবী :** ৩০
♦ যয়নাব বিনতু খুযাইমা (রাঃ)
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
✡ **মনীষী চরিত :** ৩৩
♦ আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর
-নূরুল ইসলাম
✡ **হাদীছের গল্প :** ৩৯
♦ আবু নাজীহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ
✡ **গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান :** ৪০
♦ বিচার
✡ **ক্ষেত-খামার :** ৪১
♦ ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ সজনার চাষ
♦ দ্বৈত-যৌগ ফলমূল ও সবজি চাষে স্বাবলম্বী
✡ **কবিতা :** ৪২
♦ রসাতলে ♦ প্রার্থনা ♦ আলো ও আঁধার
♦ আল্লাহ্র লীলা-খেলা
✡ **সোনামণিদের পাতা** ৪৩
✡ **স্বদেশ-বিদেশ** ৪৪
✡ **মুসলিম জাহান** ৪৬
✡ **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৬
✡ **সংগঠন সংবাদ** ৪৭
✡ **প্রশ্নোত্তর** ৫০

সম্পাদকীয়

নষ্ট সংস্কৃতি

তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাত বিশ্বাসের আলোকে শারঈ নির্দেশনায় গড়ে ওঠা মানুষের সুষ্ঠু ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনাচারকেই প্রকৃত অর্থে 'সংস্কৃতি' বলা হয়। এর বাইরে সবকিছুই অপসংস্কৃতি ও কুসংস্কার। যার পরিমাণ কোন ক্ষেত্রে ১০০ শতাংশ, কোন ক্ষেত্রে ৮০ বা কমবেশী। এই অপসংস্কৃতি সামাজিক ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমনকি বলা চলে যে, জীবনের প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কমবেশী দানা বেঁধে আছে। যার অনেকগুলি আমদানিকৃত, অনেকগুলি চাপানো এবং বাকীটা আমাদের আবিষ্কৃত। অথচ এগুলির কোনটাই সত্যিকারের সংস্কৃতি নয় বরং জাহেলিয়াত ও নষ্টামি। এগুলির সংখ্যা গণনা করা সম্ভব নয়। তবে কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। যেমন-

(১) ধর্মীয় সংস্কৃতি : কোন শুভ কাজের শুরুতে মীলাদ। কেউ মারা গেলে মীলাদ, কুলখানি, চেহলাম। তাছাড়া বার্ষিক ভাগ্য রজনী হিসাবে শবেবরাত পালন, সুন্নাতে খাৎনা অনুষ্ঠান, রাসূল (ছাঃ)-এর জন্ম দিবস ও ওফাত দিবসে মীলাদুন্নবীর অনুষ্ঠান, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর আগের বুধবারে কিছুটা সুস্থতা লাভের তারিখে আখেরী চাহারশাম্বা পালন, বড় পীর আব্দুল কাদের জীলানীর ওফাত দিবস ১১ রবীউছ ছানীতে ফাতেহায়ে ইয়াযদহম বা ১১ শরীফ পালন এবং এই সাথে বিভিন্ন পীর ও ধর্মীয় নেতার জন্ম ও মৃত্যু বার্ষিকী বা ওরস পালন ইত্যাদি। ধর্মের নামে এগুলি চালু হ'লেও এগুলির পিছনে ধর্মের কোন সমর্থন নেই। যদিও অনেকে ভাবেন যে, এসব হ'ল ইসলামী সংস্কৃতির অংশ। একইভাবে রয়েছে হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মীয় ও উপজাতীয় সম্প্রদায়ের নিজস্ব আচার-অনুষ্ঠানাদি, যা তাদের সংস্কৃতির অংশ বলে অভিহিত হয়। **(২) অর্থনৈতিক সংস্কৃতি :** নবান্ন উৎসব, পলান্ন উৎসব, বৃষ্টি আনার জন্য ব্যাঙের বিবাহ দান, কাদা মাখা অনুষ্ঠান ইত্যাদি। **(৩) রাজনৈতিক সংস্কৃতি :** বিভিন্ন দিবস পালন, ছবি, মূর্তি, প্রতিকৃতি, কবর, মিনার, বেদী, সৌধ নির্মাণ ও সেখানে শ্রদ্ধা নিবেদন, অফিসে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছবি টাঙানো, সঙ্গীত গেয়ে ক্লাসে প্রবেশ করা ইত্যাদি। **(৪) আমদানীকৃত সংস্কৃতি :** যেমন আন্তর্জাতিক ভালোবাসা দিবস বা ভ্যালেন্টাইন্স ডে, রাত্রি ১২-০১ মিনিটে দিনের সূচনা, নারীর ক্ষমতায়ন নীতি, নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য বিলোপ নীতি, আধুনিকতার নামে নানাবিধ ফ্যাশন ও নগ্ন সংস্কৃতির নীল দংশন এবং আকাশ সংস্কৃতির অবাধ ও হিংস্র আগ্রাসন। **(৫) চাপানো সংস্কৃতি :** জন্মদিনে কেক কাটা, মঙ্গলঘট বা মোমবাতি জ্বালিয়ে বা দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করে শ্রদ্ধা নিবেদন, খেলা-ধূলার বাণিজ্যিক সংস্কৃতি, নারী-পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা ও নাচ-গানের সংস্কৃতি। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, পুলিশ ও সেনাবাহিনী, এমনকি নারীর স্বভাবধর্ম এবং তার স্বাস্থ্য ও মর্যাদার বরখেলাফ সকল কাজে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি কর্মে ও পেশায় নিয়োগ দানের অমানবিক সংস্কৃতি। জাতিসংঘ ঘোষিত নানাবিধ সনদ বাস্তবায়ন ও দিবস পালনের

সংস্কৃতি ইত্যাদি। **(৬) সামাজিক সংস্কৃতি :** বর্ষবরণ, বর্ষাবরণ, বসন্তবরণ, জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী, বিবাহ বার্ষিকী, প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ইত্যাদি।

বাংলাদেশে ইংরেজী, বাংলা ও হিজরী তিনটি নববর্ষ রয়েছে। এর মধ্যে ইংরেজী বর্ষপঞ্জী হিসাবেই এদেশে সব কাজকর্ম হয়ে থাকে। কিন্তু ১লা বৈশাখ উদযাপন করা হয় বাঙ্গালীর আবহমানকালের সার্বজনীন সংস্কৃতি হিসাবে। যা একেবারেই অনৈতিহাসিক ও ভিত্তিহীন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী মহলের ও বস্তুবাদী নাস্তিক বুদ্ধিজীবীদের দূরদর্শী নীল নকশার অংশ মাত্র। স্বাধীনতা বিরোধী এজন্য যে, এরা এদিন বাঙ্গালী সংস্কৃতির নামে নানাবিধ মূর্তি ও মুখোশ বানিয়ে রাস্তায় মিছিলে নামে। যার মাধ্যমে তারা ভারতের মূর্তিপূজারীদের সাথে সংহতি প্রকাশ করে এবং এপার বাংলা ওপার বাংলার মেল বন্ধনের জন্য গদগদ চিত্ত হয়ে বাগাড়ম্বর করে। ওরা কথিত বাঙ্গালী চেতনার বুলি কপচিয়ে ১৯৪৭ সালে বঙ্গমাতার ব্যবচ্ছিন্ন দু'টি অঙ্গকে পুনরায় জোড়া লাগাতে চায়। নাস্তিক বস্তুবাদীদের কারসাজি এজন্য যে, এরা আদম (আঃ)-কে মানুষের আদি পিতা ও প্রথম নবী হিসাবে বিশ্বাস করে না। এরা মানুষকে পৃথক সৃষ্টি নয়, বরং বানরের বংশধর ও হনুমানের উদ্বর্তিত রূপ বলতে চায়। আর এগুলিকে বিশ্বাস করানোর জন্য কোটি বছর পূর্বেকার কথিত নানা জীবজন্তুর ফসিল আবিষ্কার করে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে বলতে চায়, এরাই ছিল মানুষের আদি পুরুষ। এরা মানবসৃষ্টি সম্পর্কে কুরআন-হাদীছের বাণীকে অস্বীকার করে। এরা অতি চতুরতার সাথে বিভিন্ন শহরে 'গুহা মানব'-এর কৃত্রিম প্রদর্শনীর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তরুণদের বুঝাতে চায় যে, তোমরা গুহাবাসী অসভ্য অমানুষ ছিলে। এখন শহরবাসী সভ্য মানুষ হয়েছ। ১লা বৈশাখে বানর, হনুমান, সাপ-পেঁচা ইত্যাদির মূর্তি ও মুখোশ বানিয়ে রাস্তায় প্রদক্ষিণ করার মাধ্যমে ওরা এদেশের মানুষের ঈমানী চেতনা ভুলিয়ে ডারউইনের বিবর্তনবাদী ও নাস্তিক্যবাদী চেতনার অনুসারী বানাতে চায়।

আমরা এদেশেই গ্রামে জন্মেছি, এদেশেই বড় হয়েছি। হিন্দু-মুসলমান মিলিত যে গ্রাম ছোট বেলায় দেখেছি, সেই গ্রাম আজও দেখছি। নববর্ষ উদযাপন বা বৈশাখী মেলার নাম কখনো শুনিনি, দেখিনি বা আজও হয় না। আমরা জানতাম 'মেলা' হিন্দুরা করে। যদিও আমাদের গ্রামের হিন্দুদের বৈশাখী মেলা করতে দেখিনি। মুরব্বীরা বলতেন, মুসলমানদের মেলায় যেতে নেই। ভাদ্রের শেষ দিনে সাতক্ষীরার গুড়পুকুরের মেলায় বয়স্করা কেউ গেলেও লুকিয়ে-চুরিয়ে যেত। বাড়ী এসে ভয়ে মুখ খুলতো না। অথচ আমরা জন্ম থেকেই বাঙ্গলাভাষী, আজও বাংলাভাষী। কিন্তু সংস্কৃতিতে ছিলাম তখনও মুসলমান, এখনও মুসলমান। হিন্দুরা 'নমস্কার' দিত। আমরা 'আদাব' বলতাম। কিন্তু পাল্টা নমস্কার বলতাম না। তারা 'জল' খেত। আমরা 'পানি' খেতাম। ওরা শুকর পালন করত ও তার মাংস খেত, আমরা ছাগল-গরু পালতাম ও তার মাংস খেতাম। ওরা ধুতি পরত, আমরা লুঙ্গি-পায়জামা পরতাম। ওরা পৈতা গলায় দিত, মাথায় টিকি রাখত। ওদের মেয়েরা মাথায় সিঁদুর দিত ও হাতে শাখা পরত। ওদের বিয়েতে কত যে নাচগান। আমাদের মধ্যে এসব ছিল না। তারা মাসী-পিসী, কাকা-কাকী, বাবা-মামা বলত। আমরা খালা-ফুফু, চাচা-চাচী, আব্বা-মামু বলতাম। তারা ভগবানকে ডাকত ও মূর্তিকে পূজা দিত। আমরা আল্লাহকে ডাকতাম ও মসজিদে সিজদা করতাম। তারা তাদের পূজার সময় ঢোল-বাদ্য বাজাত ও উলুধ্বনি করত। আমরা আমাদের ছালাতের সময় আযান দিতাম ও মসজিদে জামা'আতে যেতাম। তাদের সাথে আমাদের খুবই সুসম্পর্ক ছিল। আজও আছে। আমরা উভয় সম্প্রদায় একই গ্রামে শত শত বছর ধরে বসবাস করছি পরস্পরে আত্মীয়ের মত। উভয় সম্প্রদায় বাংলা ভাষায় কথা বলি। কিন্তু আমাদের উভয়ের সংস্কৃতি পৃথক। এ পার্থক্যের ভিত্তি হ'ল আক্বীদা। আমাদের আক্বীদায় রয়েছে তাওহীদ। তাদের আক্বীদায় রয়েছে শিরক। দুই আক্বীদার ভিত্তিতে দুই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। ফলে এই পার্থক্য ভাষায়, পোষাকে, সামাজিকতায় সর্বত্র ফুটে উঠেছে। তাইতো দেখি মুশরিক কবি গেয়েছেন, 'এসো হে বৈশাখ! দুর্বলেরে রক্ষা কর, দুর্জনেরে হানো'। অথচ মুসলমানের আক্বীদামতে বৈশাখের কোন ক্ষমতা নেই। সকল ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র হাতে। অতএব বাঙ্গালী সংস্কৃতি বলে পৃথক কোন সংস্কৃতির অস্তিত্ব কোন কালে ছিল না। আজও নেই। এরপরেও ১লা বৈশাখে নববর্ষ সম্পর্কে যদি কিছু বলতে হয়, তবে সংক্ষেপে সেটা এই যে, রাজস্ব আদায়ের সুবিধার্থে ফসলী সনের ১ম দিন হিসাবে ১লা বৈশাখ থেকে বাংলা নববর্ষের সূচনা হয় সম্রাট আকবরের (১৫৫৬-১৬০৫ খৃঃ) নির্দেশে তাঁর সিংহাসনারোহণের বছর ৯৬৩ হিজরীর ২রা রবীউছ ছানী মোতাবেক ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ শুক্রবার হ'তে। ফসলী সনের ১ম দিন হওয়ায় এবং ব্যবসায়ী শ্রেণীর হালখাতার দিন হওয়ায় শহরে-গ্রামে এ সময় উৎসবের আমেজ সৃষ্টি হ'ত। এ দিনটিতে দা, বটি, খোন্তা, কোদাল, লাঙ্গল, জোয়াল, গরুর গাড়ীর চাকা, পিড়ে, চৌকি, মাটির হাড়ি-পাতিল, কাঁসার থালা-বাটি-জগ ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের মেলা বসত। ফলে এ দিনটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের তারিখ হিসাবে উৎসবের চরিত্র ধারণ করত। এদিন কেউ অনৈতিক কাজ করত না। কাউকে কেউ কষ্ট দিত না। এর পিছনে কোন আক্বীদা বা সংস্কৃতি চেতনা কাজ করত না। বরং অর্থনৈতিক কারণই ছিল মুখ্য। মোগলদের সাম্রাজ্য চলে যাবার পর বর্তমানে সে কারণ আর অবশিষ্ট নেই।

উল্লেখ্য যে, সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলা নববর্ষ চালু হবার সময় বাংলাদেশে ছিল শকাব্দের ২য় মাস হিসাবে বৈশাখ মাস। কেননা শকাব্দের ১ম মাস হ'ল চৈত্র মাস। পরবর্তীকালে ১৯৬৬ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারীতে ডঃ শহীদুল্লাহ্র নেতৃত্বে গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি মাস গণনার সুবিধার্থে বৈশাখ থেকে ভাদ্র পর্যন্ত পাঁচ মাস ৩১ দিনে এবং আশ্বিন থেকে চৈত্র পর্যন্ত সাত মাস ৩০ দিনে বর্ষসূচী নির্ধারিত করেন এবং পূর্ব পাকিস্তান সরকার তা মেনে নেন। যা আজও চালু আছে। কিন্তু সম্ভবতঃ মুসলিম সম্রাট দ্বারা প্রবর্তিত হওয়ায় এবং হিজরী সনের সাথে সম্পৃক্ত থাকায় স্বাধীনতার পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা সনের পরিবর্তে শকাব্দ ব্যবহার করে আসছে। ফলে শকাব্দের চৈত্র মাস ৩১ দিনে হওয়ার কারণে তাদের পহেলা বৈশাখ আমাদের ১ দিন পরে হয়ে থাকে। অভিন্ন বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রবক্তারা এখন কী বলবেন?

প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয়, বৈশাখী সংস্কৃতির আগ্রাসনের শিকার হয়েছে এখন আমাদের জাতীয় মাছ 'ইলিশ'। কথিত

সংস্কৃতিসেবীরা এদিন 'ইলিশ-পান্তা' খেয়ে থাকেন। অথচ ইলিশের জাটকা বৃদ্ধির মওসুম হ'ল নভেম্বর থেকে মে পর্যন্ত। ইলিশ সারা পৃথিবীতে সমাদৃত। বাংলাদেশের জিডিপিতে অর্থাৎ মোট জাতীয় আয়ে এককভাবে ইলিশের অবদান ১ শতাংশ। এ মাছ মানুষের রক্তের ক্ষতিকর কোলেষ্টেরল-এর মাত্রা কমায়। এতে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে। এ ধরনের একটি মহামূল্যবান মাছকে নির্মূল করার মিশনে নামেন উভয় বাংলার কথিত বাঙ্গালী সংস্কৃতির ধারক সুশীল সমাজভুক্ত একদল লোক। এরা হাযার হাযার টাকা খরচ করে 'ইলিশ-পান্তা' খাওয়ার বিলাসী প্রতিযোগিতায় নামেন এদিন। যা পহেলা বৈশাখ উদযাপনের নামে 'নূন আনতে পান্তা ফুরায়' যাদের, তাদের সাথে নিষ্ঠুর রসিকতার শামিল। ওদিকে আরেকদল তরুণকে সারা গায়ে কালি মাখিয়ে ও কালি মাখান চট মুড়ি দিয়ে ভূত সাজিয়ে রাস্তায় চাঁদাবাজিতে নামিয়ে দেওয়া হয় এটা বুঝানোর জন্য যে, হে সভ্য পথিকেরা! তোমরা তোমাদের বুনো ও নগ্ন আদি পিতাদের কথা ভুলে যেয়ো না। অর্থাৎ সেই বিবর্তনবাদী নাস্তিক্যবাদী দর্শনের প্রতি আহ্বান। অতএব এইসব নষ্ট সংস্কৃতির আগ্রাসন থেকে জাতি যত দ্রুত মুক্তি পাবে, ততই মঙ্গল।

আল্লাহ বলেন, 'তাঁর অন্যতম নিদর্শন হ'ল রাত্রি, দিন, সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চন্দ্রকে সিজদা কর না। বরং সেই আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এদেরকে সৃষ্টি করেছেন। যদি তোমরা সত্যিকার অর্থে তাঁরই ইবাদত করে থাক' *(হামীম সাজদাহ ৩৭)*। তিনি আরও বলেন, আল্লাহ্র নিকট মাস সমূহের গণনা হ'ল ১২টি, যা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহ্র কিতাবে নির্ধারিত..' *(তওবা ৩৬)*। অর্থাৎ বর্ষ পরিক্রমা ও ঋতুবৈচিত্র্য আল্লাহ্র হুকুমেই হয়ে থাকে। সবকিছু তাঁর সৃষ্টি ও পালনের মহাপরিকল্পনারই অংশ। প্রতিটি সূর্যোদয়ের সাথে নতুন দিনের আগমন ঘটে। প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে জেগে ওঠার মাধ্যমে মৃত্যু থেকে নবজীবন পেয়ে আমরা আল্লাহ্র নামে নতুন দিনের কর্মসূচী শুরু করি। তাই প্রতিটি দিন আমাদের কাছে নতুন দিন এবং প্রতিটি রাত্রি আমাদের কাছে বিদায়ের ঘণ্টা ধ্বনি। আল্লাহ নির্ধারিত দিবস বা রাত্রি ব্যতীত অন্য কোন দিবস বা রাত্রি আমাদের কাছে বিশেষ মর্যাদা পাওয়ার দাবী রাখে না। শুভ ও অশুভ বলে কোন দিন বা রাত্রি নেই। আল্লাহ বলেন, তোমরা কাল-কে গালি দিয়ো না, আমিই কালের সৃষ্টিকর্তা। আমিই দিন ও রাতের আবর্তন-বিবর্তন ঘটিয়ে থাকি' *(মুত্তা, মিশ, হা/২২)*। অতএব কোন দিবসকে নয়, বরং দিবসের মালিক আল্লাহকে মেনে চলা ও তাঁর প্রেরিত বিধানকে জাতীয় জীবনের সর্বত্র বাস্তবায়িত করার কামনাই হবে নববর্ষের সর্বোত্তম কামনা। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!! *(স.স.)*।

বিদেশে নারী গৃহকর্মী পাঠাবেন না

-সরকারের প্রতি আমীরে জামা'আত

সঊদী আরবে প্রতি মাসে ১০ হাযার নারী গৃহকর্মী পাঠানোর সাম্প্রতিক চুক্তির খবর শুনে আমরা রীতিমত অবাক হয়েছি। যেদেশে হাযার হাযার শিক্ষিত বেকার যুবকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, সেদেশের গৃহবধূ ও অশিক্ষিত নারীদের বিদেশে পাঠিয়ে অর্থ উপার্জনের এই অনৈতিক ধারণা কিভাবে সরকারের মাথায় এল? যেখানে খোদ রাজধানী ঢাকাতেই দেশী মনিবদের হাতে নারী গৃহকর্মীরা সর্বদা নির্যাতিত হচ্ছে, যাদের রক্ষা করার ক্ষমতা সরকারের নেই। সেখানে বিদেশে নারীকর্মী পাঠিয়ে সরকার কিভাবে তাদের জীবন ও সম্মানের নিরাপত্তা দিবে? যেসব দেশে বাংলাদেশী পুরুষ কর্মীরা অন্য দেশের তুলনায় কম এমনকি অর্ধেক বেতন পায় এবং এসবের প্রতিকার করার ক্ষমতা আমাদের সরকারের আজও হয়নি, সেখানে নারী গৃহকর্মীরা তাদের মনিবদের ঘরে নির্যাতিত হ'লে তাদের প্রতিকার করবে কে? নিজ দেশের গার্মেন্টস নারী কর্মীদের সম্মানজনক মজুরী ও চাকুরী এমনকি তাদের ইযযতের গ্যারান্টি যেদেশের সরকার দিতে পারেনি, পর্যাপ্ত বেতন-ভাতার দাবী করায় যেখানে পুরুষ পুলিশের লাঠিপেটা ও বুটজুতার লাথি খেয়ে অসহায় নারী শ্রমিকদের রাস্তায় পড়ে থাকার মর্মান্তিক দৃশ্য আমাদের প্রতিনিয়ত দেখতে হয়, সেদেশের নারী গৃহকর্মীদের যদি বিদেশী গৃহকর্তারা নির্যাতন করে, তাহ'লে তার প্রতিকার চাওয়ার নৈতিক অধিকার কি আমাদের সরকারের থাকবে? এই সাথে নারীদের বলব, তোমরা দেশে থেকে বুনো কচুর পাতা খেয়ে স্বামী-সন্তান নিয়ে ইযযতের সাথে বেঁচে থাক। কিন্তু অধিক অর্থ উপার্জনের রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে মানসিক ও দৈহিক ভাবে নির্যাতিত হবার জন্য বিদেশে যেয়ো না। বিদেশে নারী নির্যাতনের লোমহর্ষক খবরগুলোর দিকে একবার তাকাও। এরপরেও যদি যেতে চাও, তাহ'লে মনে রেখ, তোমরা জাহান্নামের কীট ছাড়া আর কিছুই নও। সরকারকে বলব, নারীকর্মী নয়, পুরুষকর্মী পাঠান। তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ করে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। বিদেশে তাদের অধিকার সুরক্ষার ব্যবস্থা নিন। পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নারীর নয়, বরং পুরুষের। তাই বেকার পুরুষকে কর্মক্ষম করুন। তার পরিবার শান্তিতে থাকবে। এর বিপরীত পথে চললে সংসার ও সমাজ ধ্বংস হবে। যেমনটি ইতিমধ্যে হ'তে চলেছে।

শ্রমজীবীদের বিশ্বমানের বেতন দিন

-সরকার ও শিল্পপতিদের প্রতি আমীরে জামা'আত

১৮৮৬ সালের ১লা মে তারিখে আমেরিকার শিকাগো শহরের হে মার্কেটে পুলিশের গুলি খেয়ে নিহত ১১ জন শ্রমিকের রক্তের বিনিময়ে দৈনিক আট ঘণ্টা শ্রমনীতি চালু হ'লেও খোদ ইংল্যান্ড-আমেরিকাতে আজও পর্যন্ত শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়নি। লাখ লাখ বেকার শ্রমিককে আজও ঐসব দেশে মিটিং-মিছিলে সরগরম থাকতে দেখা যায়। এরপরেও দেশী ও বিদেশী পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরা শ্রমমূল্য কম বলে এদেশে শিল্প বিনিয়োগের আগ্রহ দেখান। প্রশ্ন হ'ল উৎপাদিত পণ্য বহুগুণ বেশী মূল্যে আপনারা বিশ্ববাজারে বিক্রি করেন, অথচ যাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা শ্রমে ঐসব পণ্য উৎপাদিত হয়, তাদের বেতন-মজুরী কেন বিশ্বমানের হবে না? ঘটা করে মে দিবস পালন করে কোন লাভ নেই। বরং শ্রমিকদের সম্মানজনক বেতন-ভাতা দিয়ে তাদের দো'আ নিন। তাহ'লে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে আপনাদের ব্যবসায়ে বরকত নেমে আসবে। দেশেও সমৃদ্ধি আসবে ইনশাআল্লাহ।

পবিত্র কুরআনে বর্ণিত ২৫ জন নবীর কাহিনী

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২৫/১১ কিস্তি)

২৫. হযরত মুহাম্মাদ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)

৬১। সারিইয়া গালেব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৭ম হিজরীর রামাযান মাস। বনু আওয়াল (بنو عوال) অথবা জুহায়না (جهينة) গোত্রের বিরুদ্ধে মীফা'আহ[1] অথবা হারাক্বাত (حرقات) নামক স্থানে ১৩০ জনের এই সেনাদল প্রেরিত হয়। যুদ্ধে তারা জয়ী হন এবং উট ও গবাদি-পশু নিয়ে ফিরে আসেন।

এই যুদ্ধে তরুণ যোদ্ধা উসামা বিন যায়েদ (ঐ সময় তাঁর বয়স ১৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে) শত্রু পক্ষের মিরদাস বিন নাহীক (مرداس بن نهيك)-কে হত্যা করেন কলেমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করার পরেও (তিনি ভেবেছিলেন যে, লোকটি মৃত্যুর ভয়ে কলেমা পাঠ করেছে)। একথা জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুবই মর্মাহত হন এবং তাকে বলেন, فَهَلاَّ شققتَ عن قلبه فتعلم أصادق هو أم كاذب؟ 'তাহ'লে কেন তুমি তার অন্তর চিরে দেখলে না, সে সত্যবাদী ছিল না মিথ্যাবাদী ছিল'?[2]

৬২। সারিইয়া আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা (سرية عبد الله بن رواحة) : ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস।[3] ৩০ জন অশ্বারোহীর এই দলটি খায়বরে প্রেরিত হয় আসীর অথবা বাশীর বিন রেযাম (أسير أو بشير بن رزام) -কে দমন করার জন্য। কেননা তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বনু গাত্বফানকে একত্রিত করছিল। আসীরকে এই বলে প্রলুব্ধ করা হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তোমাকে খায়বরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করবেন'। আসীর তার ত্রিশজন সঙ্গীসহ মুসলমানদের সাথে মদীনায় রওয়ানা হয়। কিন্তু পথিমধ্যে কুধারণার বশবর্তী হয়ে উভয় পক্ষে যুদ্ধ শুরু হয় এবং আসীর ও তার ৩০ সাথীর সকলে নিহত হয়।

৬৩। সারিইয়া বাশীর বিন সা'দ (سرية بشير بن سعد الأنصاري) : ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাস। বনু গাত্বফান অথবা ফাযারা গোত্রের ইয়ামন ও জাবার এলাকায় ৩০০ সৈন্যের এই দলটি প্রেরিত হয়। কেননা শত্রুরা তখন মদীনার সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের উপরে হামলার জন্য বিরাট একটি দল একত্রিত করেছিল। মুসলিম বাহিনীর আগমনের সংবাদ পেয়ে তাদের দল বিক্ষিপ্ত হয়ে পালিয়ে যায়। বহু গনীমত হস্তগত হয় ও দু'জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হ'লে তারা মুসলমান হয়ে যায়।

৬৪। সারিয়াহ আবু হাদরাদ আসলামী (سرية أبي حدرد الأسلمي) : ৭ম হিজরীর যুলক্বা'দাহ মাসে রাসূলের ওমরাহ পালনের পূর্বে। মাত্র দু'জন সঙ্গী সহ আবু হাদরাদকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) প্রেরণ করেন জাশম বিন মু'আবিয়া (جشم بن معاوية) গোত্রের একটি দলের বিরুদ্ধে বনু গাত্বফানের গাবাহ (الغابة) নামক স্থানে। যেখানে তারা জমা হয়েছিল ক্বায়েস গোত্রের লোকরদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে শামিল করার জন্য। আবু হাদরাদ (রাঃ) সেখানে গিয়ে এমন এক যুদ্ধ কৌশল অবলম্বন করেন যে, শত্রুপক্ষ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় এবং বহু উট ও গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৬৫। সারিইয়া ইবনু আবিল 'আওজা (سرية ابن أبي العوجاء) : ৭ম হিজরীর যিলহাজ্জ মাস। বনু সুলায়েম (بنو سليم) গোত্রকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেওয়ার জন্য ৫০ জনের এই দলটিকে পাঠানো হয়। কিন্তু তারা অগ্রাহ্য করে বলে, لا حاجة لنا إلى ما دعوتنا 'তুমি যেদিকে আমাদের আহ্বান করছ, আমাদের তার কোন প্রয়োজন নেই'। অতঃপর তারা মুসলিম দলটির বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত হয়। দলনেতা আহত হন। তবে শত্রু পক্ষের দু'জনকে তারা বন্দী করতে সক্ষম হন।[4]

---

১. *মানছূরপুরী মুনক্বা'আহ (منقعة) বলেছেন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন, ৩/১৯৭।*

২. *মুসনাদ আবু ইয়া'লা হা/১৫২২ সনদ হাসান; মুসলিম হা/২৭৭ 'ঈমান' অধ্যায়, ৪৩ অনুচ্ছেদ; বুখারী হা/৬৮৭২-এর ব্যাখ্যা, ফাৎহুল বারী ১২/২০৩; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৫০, 'ক্বিছাছ' অধ্যায়; মানছূরপুরী এটাকে পৃথক 'খারবাহ অভিযান' (سرية خربة) বলেছেন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২/১৯৭।*

৩. *মানছূরপুরী এটি ৬ষ্ঠ হিজরীর শাওয়াল মাস লিখেছেন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২/১৯৫।*

৪. *কিন্তু মানছূরপুরী বলেন যে, মুসলিম বাহিনীর ১ জন আহত ও ৪৯ জন শহীদ হন। দ্রঃ রহমাতুল্লিল আলামীন ২/১৯৮।*

৬৬। সারিইয়া গালিব বিন আব্দুল্লাহ লায়ছী (سرية غالب بن عبد الله الليثي) : ৮ম হিজরীর ছফর মাস। ২০০ লোকের একটি সেনাদল নিয়ে তিনি ফেদাক অঞ্চলের বনু মুররাহ গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন বশীর বিন সা'দের ৩০ জন সাথীর শাহাদাত স্থলে। যা ৭ম হিজরীর শা'বান মাসে সংঘটিত হয়েছিল। শত্রুদের অনেকে নিহত হয় ও বহু গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৬৭। সারিইয়াহ যাতে আত্বলাহ (سرية ذات أطلح) : ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। মুসলমানদের উপরে হামলা করার জন্য বনু কুযা'আহ (بنو قضاعة) বিরাট একটি দলকে একত্রিত করছে জানতে পেরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কা'ব বিন ওমায়ের আনছারীর নেতৃত্বে ১৫ জনের একটি সেনাদল সেখানে প্রেরণ করেন। তারা যাতু আত্বলাহ (ذات أطلح) নামক স্থানে শত্রুদের মুখোমুখি হন। তাঁরা প্রথমে তাদের ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তারা তা প্রত্যাখ্যান করে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। যাতে সকল ছাহাবীকে তীর দিয়ে ছিদ্র করে করে শহীদ করা হয় নিহতদের মধ্যে একজন মাত্র কোনভাবে বেঁচে যান।

৬৮। সারিইয়াহ যাতে ইরক্ব (سرية ذات عرق) : ৮ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু হাওয়াযেন গোত্র বারবার শত্রুদের সাহায্য করে যাচ্ছিল। ফলে তাদের দমনের জন্য শুজা' বিন ওয়াহাব আল-আসাদীর নেতৃত্বে ২৫ জনের একটি সেনাদল উক্ত গোত্রের যাতু ইরক্ব (ذات عرق) নামক স্থানে প্রেরিত হয়। যুদ্ধ হয়নি। তবে কিছু গবাদি পশু হস্তগত হয়।

৬৯। সারিইয়া মুতা (سرية مؤتة) : ৮ম হিজরীর জুমাদাল ঊলা মোতাবেক ৬২৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট অথবা সেপ্টেম্বর মাস। রোম সম্রাট ক্বায়ছারের পক্ষ হ'তে সিরিয়ার বালক্বায় (البلقاء) নিযুক্ত গবর্ণর শোরাহবীল বিন আমর আল-গাসসানীর নিকটে পত্র সহ প্রেরিত রাসূলের দূত হারেছ বিন উমায়ের আযদীকে হত্যা করা হয়। যা ছিল তৎকালীন সময়ের রীতি-নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। এটা ছিল যুদ্ধ ঘোষণার শামিল। ফলে মুসলমানদের যুদ্ধ করা ছাড়া কোন উপায় ছিল না। অতএব যায়েদ বিন হারেছাহ্র নেতৃত্বে ৩০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরিত হয়। পক্ষান্তরে শোরাহবীলের ছিল প্রায় ২ লাখ সৈন্যের এক বিশাল খৃষ্টান বাহিনী। বায়তুল মুক্বাদ্দাসের নিকটবর্তী 'মুতা' নামক স্থানে সংঘটিত এই যুদ্ধে সেনাপতি যায়েদ বিন হারেছাহ, অতঃপর সেনাপতি জাফর বিন আবু ত্বালিব, অতঃপর সেনাপতি আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা পরপর শহীদ হ'লে সকলের ঐক্যমতে খালিদ বিন ওয়ালীদ সেনাপতি হন। তিনি সম্মুখের দলকে পিছনে, পিছনের দলকে সম্মুখে ডাইনের দলকে বামে এবং বামের দলকে ডাইনে নিয়ে এক অপূর্ব রণকৌশলের মাধ্যমে মুসলিম বাহিনীকে সসম্মানে শত্রুদের হাত থেকে বাঁচিয়ে আনেন। নতুন সেনাদল যুক্ত হয়েছে ভেবে এবং মুসলমানেরা তাদেরকে মরু প্রান্তরে নিক্ষেপ করবে সেই ভয়ে রোমানরা পিছু হটে যায়। মুসলিম বাহিনীর মাত্র ১২ জন শহীদ হন। রোমক বাহিনীর হতাহতের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলেও একা খালেদ বিন ওয়ালীদের যেখানে নয় খানা তরবারি ভেঙ্গেছিল, তাতে অনুমান করা চলে কত সৈন্য তাদের ক্ষয় হয়েছিল।

তৎকালীন বিশ্বের এই সেরা পরাশক্তির সঙ্গে মুসলিম বাহিনীর এই বীরত্বপূর্ণ মুকাবিলায় খৃষ্টান বিশ্ব যেমন ভয়ে চমকে যায়, আরব বিশ্ব তেমনি হতচকিত হয়ে পড়ে। মাথা উঁচু করার স্বপ্ন ভুলে গিয়ে চির বৈরী বনু গাত্বফান, বনু সুলায়েম, বনু আশজা', বনু যুবিয়ান, বনু ফাযারাহ প্রভৃতি গোত্রগুলো ইসলাম কবুল করল। অন্যদিকে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন আরব অঞ্চলে ও দূরবর্তী অঞ্চল সমূহে মুসলিম বিজয়ের সূচনা হ'ল।

৭০। সারিইয়া যাতুস সালাসেল (سرية ذات السلاسل) : ৮ম হিজরীর জুমাদাল আখেরাহ। আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে প্রথমে ৩০০ এবং পরে আবু ওবায়দাহ ইবনুল জাররাহ (রাঃ)-এর নেতৃত্বে ২০০ মোট ৫০০ সৈন্যের এই দলটি সিরিয়া সীমান্তে বনু কুযা'আহ (بنو قضاعة) গোত্রের বিরুদ্ধে প্রেরিত হয়। এরা রোমানদের সঙ্গে মিলে মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছিল। মুসলিম বাহিনী উক্ত গোত্রের 'সালসাল' (السلسل) নামক প্রস্রবণের নিকটে অবতরণ করে বিধায় অভিযানটির নাম হয় 'যাতুস সালাসেল'। শত্রুরা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। শেষোক্ত সাহায্যকারী বাহিনীতে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) ছিলেন। কিন্তু আমর ইবনুল আছকে সেনাপতি করার উদ্দেশ্য ছিল এই যে, তাঁর দাদী অর্থাৎ পিতার মা ছিলেন অত্র এলাকার 'বালী' (بلى) গোত্রের মহিলা। সেই সুবাদে তাদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা, যাতে তারা রোমকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুসলমানদের জন্য হুমকি হয়ে না দাঁড়ায়।

৭১। সারিইয়া আবু ক্বাতাদাহ (سرية أبي قتادة) : ৮ম হিজরীর শা'বান মাস। নাজদের বনু গাত্বফানের শাখা

'মুহারিব' (محارب) গোত্রের লোকেরা মদীনায় হামলার জন্য তাদের এলাকায় খাযেরাহ (خضرة) নামক স্থানে সেনা প্রস্তুত করছে জানতে পেরে ১৫ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। তারা তাদের অনেককে হত্যা করেন ও বাকীরা পালিয়ে যায়। অনেক গনীমত হস্তগত হয়। তারা এ সফরে ১৫ দিন মদীনার বাইরে থাকেন।

৭২। গাযওয়া ফাৎহে মাক্কা (غزوة فتح مكة) বা মক্কা বিজয়ের যুদ্ধ : ৮ম হিজরীর ১০ই রামাযান মঙ্গলবার ১০,০০০ ছাহাবী নিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মদীনা হ'তে রওয়ানা হন এবং ১৭ই রামাযান মঙ্গলবার আকস্মিকভাবে মক্কায় উপস্থিত হন ও একপ্রকার বিনা যুদ্ধে মক্কা বিজয় সম্পন্ন হয়। মুসলিম পক্ষে দলছুট ২ জন শহীদ ও কাফের পক্ষে অতি উৎসাহী হয়ে অগ্রবর্তী ১২ জন নিহত হয়। মক্কা বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সবার জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ৬ষ্ঠ হিজরীর যুল-ক্বা'দাহ মাসে অনুষ্ঠিত হোদায়বিয়ার সন্ধি ভঙ্গ করার অপরাধেই কুরায়েশদের বিরুদ্ধে এই অভিযান পরিচালিত হয়।

৭৩। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ (سرية خالد بن وليد) : ৮ম হিজরীর ২৫ রামাযান। কুরায়েশ ও বনু কেনানার সবচেয়ে বড় দেবতা উযযা (العزى) দেবীমূর্তি ভাঙ্গার জন্য একটি ছোট্ট সেনাদল সহ তিনি 'নাখলা' উপত্যকায় প্রেরিত হন। মূর্তি ভেঙ্গে ফিরে এলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে পুনরায় পাঠান। সেবারে একজন বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ নগ্ন নারীকে বেরিয়ে আসতে দেখে খালেদ তাকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। ফিরে এসে এ ঘটনা বললে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, نعم تلك العزي وقد أيست أن تعبد في بلادكم أبدًا 'হাঁ এটাই উযযা। তোমাদের দেশে পূজা পাওয়ার ব্যাপারে সে এখন চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেল'।[৫] 'মূর্তিপূজারীরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নারীদের আহ্বান করে' *(নিসা ১১৭)*-এর ব্যাখ্যায় ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বলেন, مع كل صنم جنية 'হাঁ, প্রত্যেক মূর্তির সাথে একজন করে মাদী জিন থাকে'।[৬] এরা মানুষকে অলক্ষ্যে থেকে প্রলুব্ধ করে এবং দলে দলে লোকেরা বিভিন্ন মূর্তি, প্রতিকৃতি, বেদী, মিনার ও কবরে গিয়ে অযথা শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং মিথ্যা আশায় প্রার্থনা করে। যে বিষয়ে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে কোনরূপ দলীল অবতীর্ণ হয়নি।

৭৪। সারিইয়াহ 'আমর ইবনুল 'আছ (سرية عمرو بن العاص) : ৮ম হিজরীর রামাযান মাস। মক্কা থেকে তিন মাইল দূরে রেহাত (رهاط) নামক স্থানে রক্ষিত হোযায়েল গোত্রের বড় দেবমূর্তি সুওয়া' (سواع) ভেঙ্গে ফেলার জন্য আমর ইবনুল আছ (রাঃ)-কে একদল সঙ্গীসহ প্রেরণ করা হয়। প্রহরী বলল, তুমি এ কাজে সক্ষম হবে না। স্বাভাবিক ভাবেই তুমি বাধাপ্রাপ্ত হবে'। তিনি বললেন, তোমরা এখনো বাতিলের উপরে আছ? এ মূর্তি কি শুনতে পায় না দেখতে পায়? বলেই তিনি ওটাকে গুঁড়িয়ে দিলেন'। প্রহরীকে বললেন, এবার তোমার মত কি? সে বলল, أسلمت لله 'আমি আল্লাহ্র জন্য ইসলাম কবুল করলাম'।

৭৫। সারিইয়া সা'দ বিন যায়েদ আশহালী (سرية سعد بن زيد الأشهلي) : ৮ম হিজরীর রামাযান মাসে। ২০ জন অশ্বারোহী দল সহ সা'দ বিন যায়েদ (রাঃ)-কে অন্যতম প্রসিদ্ধ দেবী মূর্তি মানাত (منـاة)-কে ধ্বংস করার জন্য প্রেরণ করা হয়, যা ক্বাদীদের (قديد) মোশাল্লাল (مشلل) নামক জায়গায় স্থাপিত ছিল। এই মূর্তিকে বিশেষ করে আউস, খাযরাজ ও গাসসান গোত্রের লোকেরা পূজা করত। সা'দ মূর্তির দিকে অগ্রসর হ'তেই একটি কৃষ্ণাঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত চুল বিশিষ্ট উলঙ্গ নারীকে স্বীয় বুক চাপড়াতে চাপড়াতে বেরিয়ে আসতে দেখেন। এ সময় সে কেবল হায় হায় করছিল (تدعو بالويل)। সা'দ তাকে এক আঘাতে খতম করে দিলেন। অতঃপর মূর্তি ও ভাণ্ডারগৃহ ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলেন।

৭৬। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ (سرية خالد بن وليد) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। মুহাজেরীন, আনছার ও বনু সুলায়েম গোত্রের সমন্বয়ে ৩৫০ জনের একটি দলকে বনু জুযাইমা (بنو جُذَيْمَة) গোত্রের লোকদের নিকটে ইসলামের দাওয়াত দেবার জন্য পাঠানো হয়, যুদ্ধের জন্য নয়। কিন্তু স্থানীয়রা স্পষ্টভাবে أسلمنا 'আমরা ইসলাম কবুল করলাম' না বলে صبأنا 'আমরা ধর্মত্যাগী হয়েছি' বলে। এতে সন্দেহে পতিত হয়ে খালেদ তাদের হত্যা করতে থাকেন ও বন্দী করতে থাকেন এবং পরে প্রত্যেকের নিকটে ধৃত ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য সবাইকে নির্দেশ দেন। কিন্তু বনু সোলায়েম ব্যতীত মুহাজেরীন ও আনছার ছাহাবীগণ কেউ এ নির্দেশ মানেননি। এ ব্যাপারে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু

৫. *নাসাঈ কুবরা হা/১১৫৪৭; তাবাক্বাত ইবনু সা'দ ২/১৪৫-৪৬।*
৬. *আহমাদ হা/২১২৬৯, সনদ হাসান।*

ওমর (রাঃ) ও তার সাথীগণ ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সব ঘটনা বললে তিনি খুবই মর্মাহত হন এবং আল্লাহ্র দরবারে হাত উঠিয়ে দু'বার বলেন, اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ 'হে আল্লাহ! খালেদ যা করেছে, আমি তা থেকে তোমার নিকটে নিজেকে মুক্ত ঘোষণা করছি'।[৭] উক্ত ঘটনায় খালেদ (রাঃ)-এর সাথে মুহাজির ছাহাবী আব্দুর রহমান বিন 'আওফের কিছু উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। একথা শুনে খালেদকে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, مهلا يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك أُحُدٌ ذهبًا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركتَ غدوة رجل من أصحابي ولا روحته– 'থেমে যাও খালেদ! আমার ছাহাবীগণ থেকে বিরত হও। আল্লাহ্র কসম! যদি ওহোদ পাহাড় সোনা হয়ে যায়। আর তা সবটাই তুমি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর, তথাপি আমার একজন ছাহাবীর একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যার সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না'।[৮]

পরে আলী (রাঃ)-কে পাঠিয়ে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নিহত ব্যক্তিদের রক্তমূল্য এবং অন্যান্য ক্ষতিপূরণ দান করেন। মানছূরপুরী বলেন, এ ঘটনায় বনু জুযাইমার ৯৫ ব্যক্তি নিহত হয়। তবে এই সংখ্যা সঠিক নাও হ'তে পারে। উল্লেখ্য যে, খালেদ বিন ওয়ালীদ ও আমর ইবনুল আছ (রাঃ) ৭ম হিজরীর প্রথম দিকে এবং বনু সুলায়েম মুতা যুদ্ধের পর ৮ম হিজরীর শেষার্ধে ইসলাম কবুল করেন। সে হিসাবে এঁরা সবাই ছিলেন অপেক্ষাকৃত নতুন মুসলমান।

৭৭। গাযওয়া হোনায়েন (غزوة حنين) বা হুনায়েন যুদ্ধ : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হাওয়াযেন ও ছাক্বীফ গোত্রের আত্মগর্বী নেতারা মক্কা হ'তে আরাফাতের দিকে ২৬ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে হুনায়েন উপত্যকায় মালেক বিন আওফের নেতৃত্বে ৪০০০ দুঃসাহসী সেনার সমাবেশ ঘটায়। ফলে মক্কা বিজয়ের ১৯তম দিনে ৬ই শাওয়াল শনিবার আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মক্কার ২০০০ নও মুসলিম সহ মোট ১২,০০০ সাথী নিয়ে হুনায়েনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন এবং ১০ই শাওয়াল বুধবার রাতে গিয়ে উপস্থিত হন। যুদ্ধে শত্রুপক্ষে ৭১ জন নিহত হয় ও মুসলিম পক্ষে ৬ জন শহীদ হন। যুদ্ধে বিশাল পরিমাণের গনীমত হস্তগত হয়।

৭৮। গাযওয়া ত্বায়েফ (غزوة طائف) : ৮ম হিজরীর শাওয়াল মাস। হুনায়েন যুদ্ধে শত্রুপক্ষের নেতা মালেক বিন আওফ সহ পরাজিত ছাক্বীফ গোত্রের লোকেরা পালিয়ে গিয়ে ত্বায়েফের দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিল। প্রথমে খালিদের নেতৃত্বে ১০০০-এর একটি বাহিনী প্রেরণ করা হয়। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে গমন করেন। তারা তায়েফের দুর্গ অবরোধ করেন। এই অবরোধ কতদিন স্থায়ী ছিল এ বিষয়ে ১৫ দিন থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত মতামত রয়েছে। এই যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে ১২ জনের অধিক শহীদ হন ও অনেকে আহত হন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অবরোধ উঠিয়ে নিয়ে ফিরে আসেন। এ সময় ছাহাবীগণ তাঁকে ছাক্বীফ গোত্রের বিরুদ্ধে বদদো'আ করার আবেদন জানালে তিনি উত্তম দো'আ করে বলেন, اللهم اهد ثقيفا وآت بهم 'হে আল্লাহ! তুমি ছাক্বীফদের হেদায়াত কর এবং তাদেরকে নিয়ে এসো'।[৯] আল্লাহ সেটাই কবুল করলেন এবং কিছুদিন পর তারা নিজেরা এসে ইসলাম কবুল করল।

৭৯। সারিইয়া উয়াইনা বিন হিছন ফাযারী (سرية عيينة بن حصن الفزاري) : ৯ম হিজরীর মুহাররম মাস। বনু তামীম গোত্রের লোকেরা অন্য গোত্রের লোকদের জিযিয়া প্রদান না করার জন্য উত্তেজিত করছিল। সেকারণ তাদের বিরুদ্ধে 'ছাহরা' (الصحراء) এলাকায় ৫০ জন অশ্বারোহীর একটি দল প্রেরিত হয়। বনু তামীম পালিয়ে যায়। তাদের পুরুষ-নারী-শিশু মিলে ৬২ জনকে বন্দী করে মদীনায় আনা হয়। পর দিন তাদের ১০ জন নেতা মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করে এবং সবাইকে মুক্তি দেওয়া হয়।[১০]

৮০। সারিইয়া কুত্বাহ বিন 'আমের (سرية قطبة بن عامر) : ৯ম হিজরীর ছফর মাস। তুরবার (تربة) নিকটবর্তী তাবালা (تبالة) অঞ্চলে খাছ'আম (خثعم) গোত্রের একটি শাখার বিরুদ্ধে ২০ জনের এই দলটি প্রেরিত হয়। এরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছিল। যুদ্ধে তাদের অনেকে হতাহত হয়। মুসলিম বাহিনী উট, বকরী, নারী সহ অনেক গনীমত নিয়ে ফিরে আসে। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদের ছেড়ে দেন।

৭. *বুখারী হা/৪৩৩৯; মিশকাত হা/৩৯৭৬ 'জিহাদ' অধ্যায়, ৫ অনুচ্ছেদ।*
৮. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪৩১; ছাহাবীগণের উচ্চ মর্যাদায় বর্ণিত উক্ত মর্মে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।*
৯. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৪৮৮; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৯৮৬।*
১০. *চরিতকারগণ এই ঘটনাকে ৯ম হিজরীর মুহাররম মাস বললেও মুবারকপুরী এতে ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। যদিও তিনি পৃথক কোন সাল বা তারিখ উল্লেখ করেননি।*

৮১। সারিইয়া যাহহাক বিন সুফিয়ান কেলাবী (سرية ضحاك بن سفيان الكلابي) : ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বনু কেলাব গোত্রকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য এই দলটিকে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু বনু কেলাব তাতে অস্বীকার করে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হয়। ফলে তাদের একজন নিহত হয়।

৮২। সারিইয়া আলী ইবনে আবী ত্বালেব (سرية علي بن أبي طالب) : ৯ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাস। বিখ্যাত খৃষ্টান গোত্র ত্বাঈ (الطيئ)-এর 'ফুলস' (الفلس) মূর্তিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য ১৫০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। মূর্তি ভাঙ্গার পর দানবীর হাতেম তাঈ-এর পরিবার সহ অনেকে বন্দী হয়ে মদীনায় নীত হন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে সসম্মানে মুক্তি দেন। হাতেম তাঈ-এর বৃদ্ধা কন্যা সাফানাহ (سفانة) মুক্তি পেয়ে পলাতক ভাই খ্যাতনামা বিদ্বান ও গোত্রনেতা 'আদী ইবনে হাতেমকে পাবার জন্য সিরিয়ায় যান। পরে 'আদী মদীনায় এসে মুসলমান হয়ে যান।

৮৩। সারিইয়া আলক্বামা বিন মুজযিয আল-মুদলেজী (سرية علقمة بن مجزز المدلجي) : ৯ম হিজরীর রবীউল আখের। হাবশার কিছু নৌদস্যু জেদ্দা তীরবর্তী এলাকায় সমবেত হয়ে মক্কায় হামলা করার ষড়যন্ত্র করছে জানতে পেরে ৩০০ জনের এই বাহিনী প্রেরিত হয়। আলক্বামা একদল সাথী নিয়ে সাগরে নেমে যান ও একটি দ্বীপে পৌঁছে যান। এ খবর পেয়ে দস্যুদল দ্রুত পালিয়ে যায়।[১১] মানছূরপুরী দলনেতার নাম আব্দুল্লাহ বিন হুযাফাহ আল-ক্বারশী আস-সাহমী (عبد الله بن حذافة القرشي السهمي) লিখেছেন।[১২]

৮৪। গাযওয়া তাবূক (غزوة تبوك) : ৯ম হিজরীর রজব মাস। এটাই ছিল রাসূলের জীবনের শেষ যুদ্ধ এবং যা রোমকদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়। এ সময় মুসলিম বাহিনীতে সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩০,০০০ এবং রোমকদের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৪০,০০০-এর বেশী। গত বছরে মুতার যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য তারা সরাসরি মদীনায় হামলার প্রস্তুতি নেয়। তাতে মদীনার সর্বত্র রোমক ভীতির সঞ্চার হয়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও রাসূল (ছাঃ) তাদের প্রতিরোধে রোমান সীমান্ত অভিমুখে যাত্রা করলে তারা ভীত হয়ে পালিয়ে যায়। রামাযান মাসে মুসলিম বাহিনী মদীনায় ফিরে আসে।

এই অভিযান কালে সূরা তওবার অনেকগুলি আয়াত নাযিল হয়। ৫০ দিনের এই সফরে ৩০ দিন যাতায়াতে এবং ২০ দিন তাবূকে অবস্থানে ব্যয়িত হয়। এই যুদ্ধকালের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ছিল নিম্নরূপ- (১) যুদ্ধের প্রাক্কালে মদীনায় কঠিন দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছিল। এমনকি পর্যাপ্ত ভরণ-পোষণ দাবী করায় ও তাতে ব্যর্থ হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর স্ত্রীদের সাথে মাসব্যাপী সঙ্গত্যাগের অর্থাৎ 'ঈলা' করার ঘোষণা দিতে বাধ্য হন (২) অন্য দিকে মুনাফিকরা মুসলিম বাহিনীতে ফাটল সৃষ্টির জন্য ক্বোবায় 'মসজিদে যেরার' তৈরী করে এবং রাসূলকে সেখানে ছালাত আদায়ের আমন্ত্রণ জানায়। তাবূক থেকে ফিরে এসে তিনি সেখানে যাবেন বলে কথা দেন। (৩) যুদ্ধের ফাণ্ডে দানের প্রতিযোগিতা হয়। আবুবকর (রাঃ) তাঁর সকল সম্পদ মিলিয়ে ৪০০০ দিরহাম, ওমর (রাঃ) তাঁর অর্ধেক সম্পদ, মহিলাগণ তাদের গহনা-পত্র এবং অন্যান্য ছাহাবীগণ তাদের সাধ্যমত দান করেন। এদিন সবার উপরে দান ছিল হযরত ওছমানের। রাসূলের কোলে ১০০০ স্বর্ণমুদ্রা ছড়িয়ে দেওয়া ছাড়াও তিনি ৯০০ উট ও ১০০ ঘোড়া এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি দান করে রাসূলের বিশেষ দো'আ লাভ করেন। কিন্তু মুনাফিকরা দান করা থেকে বিরত থাকে। (৪) দুর্বল অজুহাত দেখিয়ে তিন জন নিষ্ঠাবান মুসলমান এদিন যুদ্ধে যাননি (৫) গড়ে ১৮ জনের একটি দলের জন্য বাহন ছিল মাত্র ১টি উট (৬) গাছের ছাল-পাতা খেয়ে ও যবেহকৃত উটের নাড়ী-ভুঁড়ির পানি পান করে ছাহাবীগণ অতিকষ্টে বেঁচে থাকেন। এজন্য এ যুদ্ধকে 'জায়শুল 'উসরাহ' (جيش العسرة) বা 'কষ্টের যুদ্ধ' নামে অভিহিত করা হয়। (৭) ছামূদ জাতির গযবের স্থান 'হিজর' অতিক্রম করার সময় সেখানকার পানি পান না করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয় (৮) মু'জেযার মাধ্যমে একটি শুষ্ক ঝর্ণা হ'তে অবিরাম পানি নির্গত হয় (৯) ছালাত তাক্বদীম ও তাখীরের মাধ্যমে জমা ও ক্বছর করা হয় (১০) প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের ফলে শত্রু পক্ষের মনে ভীতির সঞ্চার হয় (১১) মদীনায় ফেরার সময় একটি সংকীর্ণ গিরিপথে ১২ জন মুখোশ ধারী মুনাফিক রাসূলকে হত্যা প্রচেষ্টা চালায় (১২) তাবূক থেকে ফেরার দিন মদীনায় কিশোর-কিশোরীরা বিজয়ী রাসূলকে জানায় উষ্ণ অভ্যর্থনা জানায় طلع البدر علينا... বলে।

৮৫। সারিইয়া খালেদ বিন ওয়ালীদ (سرية خالد بن وليد) : ৯ম হিজরীর রজব মাস। বিনা যুদ্ধে বিজয় শেষে

১১. *ফাৎহুল বারী ৮/৫৯ পৃঃ।*
১২. *রহমাতুল্লিল আলামীন ২/২০২।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাবূকে অবস্থানকালেই পার্শ্ববর্তী দূমাতুল জান্দালের (دومة الجندل) খৃষ্টান নেতা উকাইদারের (أكيدر) বিরুদ্ধে ৪২০ জনের সেনাদল সহ খালেদকে প্রেরণ করেন। খালেদ তাকে বন্দী করে রাসূলের দরবারে আনেন এবং তার সাথে সন্ধিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৮৬। সারিইয়া উসামাহ বিন যায়েদ বিন হারেছাহ (سرية أسامة بن زيد بن الحارثة) : ১১ হিজরীর ছফর মাস। রোম সম্রাটের অহংকার চূর্ণ করার জন্য এবং মো'আন (معان) ও পার্শ্ববর্তী আরব অঞ্চলের রোমক গবর্ণর ফারওয়াহ বিন 'আমর আল-জোযামীকে ইসলাম কবুলের অপরাধে শূলে বিদ্ধ করে হত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য এ অভিযান প্রেরিত হয়। সিরিয়ার বালক্বা' ও ফিলিস্তীন অঞ্চল অশ্বারোহীদের দ্বারা পদদলিত করে রোমকদের ভীত করাই ছিল এ অভিযানের উদ্দেশ্য। অভিযান প্রেরণকালে উসামার হাতে পতাকা দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, سر إلى موضع قتل أبيك فأوطنهم الخيل 'যাও তোমার পিতার নিহত হওয়ার স্থানে এবং সেখানকার লোকদের ঘোড়ার পায়ে পিষ্ট করো'। বড় বড় ছাহাবী উসামাকে সেনাপতি হিসাবে মেনে নিতে না পারলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়ে বলেন, তোমরা তার পিতার ব্যাপারেও এরূপ বলেছিলে। আল্লাহ্র কসম! সে যোগ্য ছিল। তার পুত্রও যোগ্য'।

কিন্তু মদীনা হ'তে তিন মাইল দূরে 'জুরফ' নামক স্থানে পৌঁছে রাসূলের শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর শুনে বাহিনী সেখানেই যাত্রা বিরতি করে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পরে আবুবকরের খেলাফতকালে উক্ত বাহিনী পুনরায় যাত্রা করে এবং বিজয়ী বেশে ফিরে আসে।

উল্লেখ্য যে, মানছূরপুরী ৮২টি অভিযানের তালিকা দিয়েছেন। আমরা তাঁর তালিকা ও মুবারকপুরীর তালিকা মিলিয়ে মোট ৮৬টি পেয়েছি, যা লিপিবদ্ধ করলাম। আল্লাহ সর্বাধিক অবগত।

উভয় পক্ষে শহীদ ও নিহতদের সংখ্যা :

মাদানী জীবনে ৮ বছরে সংঘটিত ৮৬টি গাযওয়া ও সারিইয়ার মধ্যে ২৯টি গাযওয়া ও ৫৭টি সারিইয়াতে উভয় পক্ষে নিহত ও শহীদগণের সঠিক তালিকা নির্ণয় করা মুশকিল। মানছূরপুরী যে তালিকা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় যে, মুসলিম পক্ষে শহীদ হয়েছেন ২৫৯ জন এবং কাফের পক্ষে নিহত হয়েছেন ৭৫৯ জন। উভয়পক্ষে সর্বমোট নিহতের সংখ্যা ১০১৮ জন।[১৩] কিন্তু মানছূরপুরী ও মুবারকপুরী উভয়ের দেওয়া যুদ্ধের বর্ণনা সমূহ হিসাব করে দেখা গেছে যে, মুসলিম পক্ষে ৩৩৯ জন এবং কাফির পক্ষে ১০৯১ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে মানছূরপুরী সারিইয়া ইবনু আবিল আওজা-তে (ক্রমিক ৬৫) মুসলিম পক্ষে ৪৯ জন শহীদ বলেছেন, যেটা ৩৩৯ জনের হিসাবে ধরা হয়েছে। কিন্তু মুবারকপুরী উক্ত বিষয়ে কিছু বলেননি। অনুরূপভাবে গাযওয়া বনু কুরায়যাতে ইহুদীপক্ষে নিহতের সংখ্যা মানছূরপুরী ৪০০ বলেছেন। কিন্তু মুবারকপুরী ৬০০ থেকে ৭০০-এর মধ্যে বলেছেন। মানছূরপুরী ৪০০ ধরে হিসাব করেছেন। কিন্তু আমরা ৬০০ ধরে হিসাব করেছি। ফলে কাফের পক্ষে আমাদের হিসাব তাঁর চাইতে বেশী হয়েছে। এর পরেও ৭টি সারিইয়ায় প্রতিপক্ষের নিহতের সংখ্যা উল্লেখ না করে বলা হয়েছে 'কিছু লোক'। অতএব কাফের পক্ষে নিহতের সংখ্যা আরও কিছু বাড়তে পারে। উল্লেখ্য যে, সবচেয়ে বড় ৯টি যুদ্ধে অর্থাৎ বদর (ক্রমিক-৯) ওহোদ (২০), খন্দক (৩১), খায়বর (৫২), মুতা (৬৯), মক্কা বিজয় (৭২), হোনায়েন (৭৭), ত্বায়েফ (৭৮) ও তাবূক (৮৪) যুদ্ধে মুসলিম পক্ষে যথাক্রমে ১৪, ৭০, ৬, ১৮, ১২, ২, ৬, ১২, ০০=১৪০ জন এবং কাফের পক্ষে ৭০, ৩৭, ১০, ৯৩, ০০, ১২, ৭১, ০০, ০০=২৯৩ জন সহ সর্বমোট ৪০৩ জন নিহত হয়েছে। তাবূক যুদ্ধে কোন পক্ষে হতাহত হয়নি। আধুনিক জাহেলিয়াতের যুগে তথাকথিত গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার নামে যেভাবে দেশে দেশে নির্বিচারে মানুষ হত্যা করা হয়, তার তুলনায় এগুলি তৃণসম বলা চলে।

অভিযান সমূহ পর্যালোচনা

অভিযানগুলির মধ্যে ১ হ'তে ৭২-এর মধ্যে মোট ২১টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে কুরায়েশদের বিরুদ্ধে। ১১ হ'তে ৫৩-এর মধ্যে মোট ৮টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে ইহুদীদের বিরুদ্ধে। ৪৪ হ'তে ৮৬-এর মধ্যে ৬টি অভিযান খৃষ্টানদের বিরুদ্ধে এবং ১০ হ'তে ৮৩-এর মধ্যে মোট ৫১টি অভিযান পরিচালিত হয়েছে নাজদ ও অন্যান্য এলাকার বেদুঈন গোত্র ও সন্ত্রাসী ডাকাত দলের বিরুদ্ধে। এর মধ্যে ২৪, ২৫ ও ৩৭ নং সারিইয়াহ তিনটি ছিল স্রেফ তাবলীগী কাফেলা এবং প্রতারণামূলকভাবে যাদের প্রায় সবাইকে হত্যা করা হয়। বদর সহ প্রথম দিকের ৯টি অভিযান ছিল কুরায়েশদের বাণিজ্য কাফেলা লুট করে তাদের আর্থিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতি ভণ্ডুল করার জন্য।

১৩. *রহমাতুল লিল আলামীন ২/২১৩ পৃঃ।*

শুরুতে কুরায়েশদের মূল লক্ষ্য ছিল তাদের ভাষায় ছাবেঈ (صـــابئي) বা বিধর্মী মুহাম্মাদ ও তাঁর সাথী মুষ্টিমেয় মুহাজিরদের নির্মূল করা এবং সেখানে আক্রোশটা ছিল প্রধানতঃ ধর্মবিশ্বাস গত। কিন্তু পরে তাদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় মদীনা হয়ে সিরিয়ায় তাদের ব্যবসায়িক পথ কণ্টকমুক্ত করা। সেই সাথে ছিল তাদের বড়ত্বের অহংকার। কেননা মুহাম্মাদ তাদের বহিস্কৃত সন্তান হয়ে তাদের চাইতে বড় হবে ও তাদের উপরে প্রাধান্য বিস্তার করবে, এটা ছিল তাদের নিকটে নিতান্তই অসহ্য। তাদের এই ক্ষুব্ধ ও বিদ্বেষী মানসিকতাকেই কাজে লাগায় ধূর্ত ইহুদী নেতারা ও অন্যান্যরা। ফলে মক্কা বিজয়ের পূর্বেকার মুসলিম অভিযানগুলির অধিকাংশ ছিল প্রতিরোধ মূলক।

ইহুদীদের বিরুদ্ধে অভিযানগুলি হয় তাদের চুক্তিভঙ্গের কারণে এবং অবিরত ভাবে তাদের চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের কারণে। খৃষ্টানদের কোন তৎপরতা মদীনায় ছিল না। সিরিয়ার নিকটবর্তী দূমাতুল জান্দালে প্রথম যে অভিযানটি (ক্রমিক-৪৪) তাদের দিকে প্রেরিত হয়, সেটি ছিল মূলতঃ তাবলীগী মিশন এবং তাতে তাদের গোত্রনেতাসহ সকলে মুসলমান হয়ে যায়। পরে যে মুতার যুদ্ধ (ক্রমিক-৬৯) হয়, সেটি ছিল সিরিয়া অঞ্চলে রোমক গবর্ণর শোরাহবীলের মুসলিম দূত হত্যার প্রতিশোধ হিসাবে। তাবূক যুদ্ধ ছিল আগ্রাসী রোম সম্রাটের বিরুদ্ধে এবং তার প্রেরিত বিশাল বাহিনীর মদীনা আক্রমণ ঠেকানোর জন্য। অবশেষে রোমকরা ভয়ে পিছু হটে গেলে কোন যুদ্ধ হয়নি।

উল্লেখ্য যে, ৩য় হিজরীতে ওহোদ যুদ্ধে মুনাফেকী করার কারণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাদেরকে আর কোন যুদ্ধে যাবার অনুমতি দেননি। কিন্তু আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ও অন্যান্যদের প্রকাশ্যে তওবা ও বারবার অনুরোধে তিনি তাদেরকে ৫ম হিজরীতে মুছত্বালিক যুদ্ধে (ক্রমিক-৪৩) যাবার অনুমতি দেন। কিন্তু তারা যথারীতি মুনাফেকী করে। পরে তাদেরকে আর কোথাও অনুমতি দেওয়া হয়নি। কিন্তু তাবূক অভিযানে (ক্রমিক-৮৪) তাদের ১২ জন এজেন্ট গোপনে ঢুকে পড়ে ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার চেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

পরিশেষে বলা চলে যে, ইসলামের দাওয়াত মক্কায় ছিল কেবল প্রচারমূলক। কিন্তু মদীনায় ছিল প্রচার ও প্রতিরোধ উভয় প্রকারের। যুগে যুগে ইসলামী দাওয়াতে উভয় নীতিই প্রযোজ্য হয়েছে। এখানে হারাম মাসে যুদ্ধ করার অনুমতিও পাওয়া গেছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যার সূত্রপাত ঘটে নাখলা যুদ্ধে (ক্রমিক-৮)। এ প্রসঙ্গে সূরা বাক্বারাহ ২১৭নং আয়াতটি নাযিল হয়।

রাসূলকে হত্যা প্রচেষ্টা সমূহ :

(১) **হিজরতের রাতে :** ১৪শ নববী বর্ষের ২৭শে ছফর মোতাবেক ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১২ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দিবাগত মধ্যরাতের পর।

(২) পরদিন ১৩ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার ছওর পাহাড়ের গুহামুখে উপস্থিত শত্রুদের ব্যর্থ চেষ্টা। যারা ১০০ উট পাওয়ার লোভে তাঁর সন্ধানে বের হয়েছিল।

(৩) ৬২২ খৃষ্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর বুধবার বনু মুদলিজ গোত্রের নেতা সুরাক্বা বিন মালেক বিন জু'শুম কর্তৃক হিজরতের পথিমধ্যে হামলার ব্যর্থ প্রচেষ্টা।

(৪) পরদিন ১৯শে সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সাক্ষাত যমদূত হিসাবে দেখা দেয় বিখ্যাত আরব বীর বুরাইদা আসলামী ও তার ৭০ জনের একটি পুরস্কার লোভী দল। কিন্তু রাসূলের সঙ্গে কথা বলার পর বুরাইদা তার দলবলসহ ওখানেই মুসলমান হয়ে যায় ও রাসূলের দেহরক্ষী বনে যায়।

(৫) ২য় হিজরীর ১৭ই রামাযানে সংঘটিত বদর যুদ্ধের কয়েক দিন পরে মক্কার নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়ার কুপরামর্শে দুষ্টমতি ওমায়ের বিন ওয়াহাব আল-জামহী (عمير بن وهب الجمحي) তীব্র বিষ মিশ্রিত তরবারি নিয়ে মদীনা আগমন করে। কিন্তু রাসূল (ছাঃ) তাকে দেখেই কাছে ডেকে নিয়ে মক্কায় বসে ছাফওয়ান ও তাঁর মধ্যকার গোপন পরামর্শ এবং তার হত্যা পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দেন। এতে সে হতবাক হয়ে আত্মসমর্পণ করে ও মুসলমান হয়ে যায়। পরে মক্কায় ফিরে গিয়ে তার দাওয়াতে বহু লোক ইসলামে দাখিল হয়।

(৬) ৪র্থ হিজরীর রবীউল আউয়াল মোতাবেক ৬২৫ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পূর্বের সন্ধিচুক্তি অনুযায়ী রক্তমূল্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বনু নাযীরের ইহুদীদের কাছে এলে অর্থ প্রদানের ওয়াদা দিয়ে তাঁকে বসিয়ে রেখে দেওয়ালের উপর থেকে বড় পাথর ফেলে তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু অহি-র মাধ্যমে জানতে পেরে রাসূল (ছাঃ) সেখান থেকে দ্রুত ফিরে আসেন।

(৭) ৬ষ্ঠ হিজরীর মুহাররম মাসে ইয়ামামাহ্র হানীফা গোত্রের নেতা ছুমামাহ বিন আছাল হানাফী (ثمامة بن أثال الحنفـــي)। ইয়ামামার নেতা মুসায়লামাহ্র নির্দেশে রাসূলকে হত্যা করার জন্য ছদ্মবেশে মদীনায় আসছিল। কিন্তু পথিমধ্যে সে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ্র সেনাদলের হাতে

ধরা পড়ে যায়। মদীনায় আনার পর তিনদিন মসজিদে নববীতে তাকে বেঁধে রাখা হয়। তারপর তাকে মুক্তি দিলে সে মুসলমান হয়ে মক্কায় ওমরাহ করতে যায় এবং ইসলামের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(৮) ৬ষ্ঠ হিজরীর রামাযান মাসে বনু ফাযারাহ (بنو فزارة) গোত্রের একটি শাখার নেত্রী উম্মে কুরফা (أم قرفـــة) রাসূলকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং এজন্য ৩০ জন সশস্ত্র ব্যক্তিকে নিয়োগ করে। কিন্তু তারা আবুবকর অথবা যায়েদ বিন হারেছাহ্র সেনাদলের হাতে গ্রেফতার হয়ে নিহত হয়।

(৯) ৭ম হিজরীর মুহাররম মাসে খায়বর বিজয়ের পরে সেখানেই তাঁর পূর্বপরিচিত ইহুদী নেতা সালাম বিন মুশকিমের স্ত্রী যয়নব বিনতুল হারেছ রাসূলকে হাদিয়া দেওয়ার জন্য তাঁর প্রিয় খাদ্য বকরীর ভূনা রান বিষমিশ্রিত করে নিয়ে আসে। রাসূল (ছাঃ) তা চিবানোর পর না খেয়ে ফেলে দেন। এভাবে আল্লাহ্র রহমতে তিনি বেঁচে যান।

(১০) ৭ম হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসে যাতুর রেক্বা যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে বিশ্রাম স্থলের একটি গাছে ঝুলানো রাসূলের তরবারি হাতে নিয়ে গাওরাছ ইবনুল হারেছ নামক জনৈক বেদুঈন রাসূলকে হুমকি দিয়ে বলে, এবার তোমাকে কে রক্ষা করবে? রাসূল (ছাঃ) দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, আল্লাহ। তখন তরবারি খানা তার হাত থেকে পড়ে যায় এবং পরে সে মুসলমান হয়ে যায়।

(১১) ৮ম হিজরীর ১৭ই রামাযান মক্কা বিজয়ের পর কা'বা গৃহ ত্বাওয়াফকালে ফাযালাহ বিন ওমায়ের রাসূলকে হত্যার জন্য তাঁর নিকটবর্তী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে তার কুমতলবের কথা ফাঁস করে দিলে সে মুসলমান হয়ে যায়।

(১২) ৯ম হিজরীর রামাযান মাসে তাবূক অভিযান থেকে ফেরার পথে এক সংকীর্ণ গিরিসংকটে ১২ জন মুখোশধারী মুনাফিকের একটি দল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে নিরিবিলি পেয়ে তাঁকে হত্যার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়।

(১৩) ১০ম হিজরী সনে বনু 'আমের বিন ছা'ছা'আহ্র প্রতিনিধি দলের নেতা 'আমের বিন তোফায়েল ও আরবাদ বিন ক্বায়েস রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদীনায় মসজিদে নববীতে হত্যার প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও তরবারি কোষ হ'তে বের না হওয়ায় তারা ব্যর্থ হয় এবং রাসূলের বদদো'আয় মদীনা থেকে ফেরার পথে তাদের প্রথমজন হঠাৎ ঘাড়ে ফোঁড়া উঠায় এবং দ্বিতীয় জন বজ্রাঘাতে নিহত হয়।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপরে জাদু

হত্যা প্রচেষ্টা ছাড়াও তাঁকে জাদু করে পাগল বানিয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করে ষড়যন্ত্রকারীরা। ইহুদীদের মিত্র বনু যুরায়েক্ব গোত্রের লাবীদ ইবনুল আ'ছাম (لبيد بن الأعصم) নামক জনৈক মুনাফিক তার মেয়েদের মাধ্যমে এই জাদু করে। প্রথমে সে রাসূলের বাসার কাজের ছেলের মাধ্যমে কয়েকটি চুল সহ রাসূলের ব্যবহৃত চিরুনীটি সংগ্রহ করে। অতঃপর তার কন্যাদের দ্বারা উক্ত চুলে ১১টি জাদুর ফুঁক দিয়ে ১১টি গিরা দেয় ও তার মধ্যে ১১টি সুচ ঢুকিয়ে দেয়। অতঃপর চুল ও সুচ সমেত চিরুনীটি একটি খেজুরের কাঁদির খোলা আবরণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 'যারওয়ান' কূপের তলায় একটি বড় প্রস্তর খণ্ডের নীচে চাপা দিয়ে রাখে। মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, উক্ত জাদুর প্রভাবে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) মাঝে মধ্যে দিশেহারা হয়ে পড়তেন। যে কাজ করেননি, তা করেছেন বলে অনুভব করতেন। একরাতে স্বপ্নে দু'জন ফেরেশতা এসে নিজেদের মধ্যে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাঁকে জাদুর বিষয়ে সবকিছু অবহিত করেন। ফলে পরদিন আলী, যুবায়ের ও আম্মার ইবনে ইয়াসির সহ একদল ছাহাবী গিয়ে উক্ত কূয়া সেঁচে পাথরের নীচ থেকে খেজুরের কাঁদির খোসা সহ চিরুনীটি বের করে আনেন। ঐ সময় সূরা ফালাক্ব ও নাস নাযিল হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐ দুই সূরার ১১টি আয়াতের প্রতিটি পাঠ শেষে এক একটি গিরা খুলতে থাকেন। অবশেষে সব গিরা খুলে গেলে তিনি স্বস্তি লাভ করেন।

লোকেরা ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করে বলেন, إما أنا فقد شفاني الله وكرِهتُ أنْ أُثيِّرَ على النـــاس شـــرًا 'আল্লাহ আমাকে রোগমুক্ত করেছেন (এটাই যথেষ্ট)। লোকদের মধ্যে মন্দ ছড়িয়ে পড়ুক, এটা আমি চাই না'।[১৪]

১৪. *ছহীহ বুখারী, হা/৬৩৯১; আহমাদ, বায়হাক্বী দালায়েল ও তাফসীরে ইবনে কাছীর অবলম্বনে।*

বদর হ'তে ওহোদ

(২ হিঃ ১৭ই রামাযান হ'তে ৩হিঃ ৭ই শাওয়াল)

বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর অভূতপূর্ব বিজয়ে ৪টি পক্ষ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়। মক্কার কুরায়েশরা, মদীনার ইহুদী ও মুনাফিকেরা এবং মদীনার আশপাশের নাজদ প্রভৃতি এলাকার বেদুঈনরা। যারা ছিল স্রেফ দস্যুশ্রেণী। ডাকাতি ও লুণ্ঠন ছিল যাদের পেশা। ঈমান ও কুফর কোনটির প্রতি তাদের কোন আকর্ষণ ছিল না। উপরোক্ত চারটি গোষ্ঠীর প্রত্যেকেই নিশ্চিত ছিল যে, মদীনায় কোন ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হ'লে তা অবশ্যই তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাবে। সেকারণ তারা সাধ্যমত সকল উপায়ে মদীনায় একটি স্থিতিশীল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করতে থাকে। এ সময়কার গুরুত্বপূর্ণ কিছু ঘটনা নিম্নে সংক্ষেপে উদ্ধৃত হ'ল-

(১) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র : বদর যুদ্ধে গ্লানিকর পরাজয়ে এবং শীর্ষ নেতাদের হারিয়ে কুরায়েশরা যখন ক্ষোভে-দুঃখে আত্মহারা, তখন এই অপমানের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অন্যতম নেতা ছাফওয়ান বিন উমাইয়া বদর যুদ্ধের সামান্য পরে একদিন কা'বা গৃহের রুকনে হাতীমে বসে ওমায়ের বিন ওহাব আল-জামহীর সঙ্গে শলা-পরামর্শ করল যে, তুমি তোমার ছেলেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে মদীনায় গিয়ে মুহাম্মাদের সঙ্গে কথা বলার সময় তাকে হত্যা করবে। বিনিময়ে আমি তোমার যাবতীয় ঋণ পরিশোধের ও তোমার পরিবার পালনের দায়িত্ব নিচ্ছি। উল্লেখ্য যে, ওমায়ের-এর পুত্র ওহাব বদর যুদ্ধে বন্দী হয়ে মদীনায় ছিল। দু'জনের মধ্যে এই চুক্তি হওয়ার পরে এবং তা সম্পূর্ণ গোপন রাখার শর্তে ওমায়ের বিন ওহাব ভালভাবে বিষ মাখানো একটা তরবারি নিয়ে মদীনায় গিয়ে হাযির হ'ল। হযরত ওমর (রাঃ) তাকে ঘাড় ধরে রাসূলের কাছে নিয়ে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ছেড়ে দিতে বললেন। অতঃপর ওমায়ের তাঁর নিকটে এসে আরবদের রীতি অনুযায়ী বলল, أنعموا صباحا 'সুপ্রভাত'। জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বল্লেন, আল্লাহ আমাদেরকে এর চাইতে উত্তম অভিবাদন রীতি প্রদান করেছেন অর্থাৎ সালাম, السلام عليكم যা হ'ল জান্নাতীদের অভিবাদন *(ইউনুস ১০/১০)*।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার আসার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে তার ছেলের মুক্তির জন্য রাসূলের সহানুভূতি কামনা করল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তাহ'লে তরবারি কেন এনেছ? সে বলল, এর ধ্বংস হৌক। এটা কি আমাদের কোন কাজে লেগেছে? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বারবার সত্য কথা বলার তাকীদ দিলেও সে চেপে যায়। তখন তিনি মক্কায় তাদের দু'জনের মধ্যকার গোপন শলা-পরামর্শের কথা ফাঁস করে দেন। এতে সে হতবাক হয়ে গেল। অতঃপর কলেমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে উত্তম রূপে দ্বীন ও কুরআন শিখতে বললেন এবং তার ছেলেকে মুক্তি দিলেন। কিছুদিন পর সে রাসূলের অনুমতি নিয়ে মক্কায় গিয়ে ওমরাহ করল এবং সেখানে তার হাতে অনেকে মুসলমান হ'ল। ছাফওয়ান শপথ করল যে, তার সঙ্গে কখনো কথা বলবে না এবং তার কোন উপকার করবে না। অবশ্য ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর ছাফওয়ান মুসলমান হয়ে যান।

(২) ইহুদী চক্রান্ত : কয়েকটি নমুনা : (ক) মক্কার কাফেরদের প্রদত্ত নানাবিধ অপবাদের ন্যায় মদীনার ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে রা'এনা (راعنا) বলে ডাকতে থাকে। আরবী ভাষায় যার অর্থ 'আমাদের তত্ত্বাবধানকারী'। মাদ্দাহ الرعاية والحفظ। এই লকবে ডেকে তারা বাহ্যতঃ মুসলমানদের খুশী করতে চাইত। কিন্তু এর দ্বারা তারা নিজেদের হিব্রু ভাষা অনুযায়ী راعينوا শريرنا অর্থাৎ 'আমাদের দুষ্ট ব্যক্তিটি' অর্থ গ্রহণ করত। তাদের এই চালাকি বন্ধ করার জন্য আল্লাহ পাক এটাকে নিষিদ্ধ করে 'উনযুরনা' (انظرنا) অর্থাৎ 'আমাদের দেখাশুনা করুন'-লকবে ডাকতে নির্দেশ দিলেন *(বাক্বারাহ ২/১০৪)*।

(খ) ইবনু ইসহাক বর্ণনা করেন যে, শাস বিন ক্বায়েস (شاس بن قيس) নামক জনৈক বৃদ্ধ ইহুদী মুসলমানদের প্রতি চরম বিদ্বেষ পোষণ করত। একদিন সে ছাহাবায়ে কেরামের একটি মজলিসের নিকট দিয়ে গমন করছিল, যেখানে আউস ও খাযরাজ উভয় গোত্রের ছাহাবী ছিলেন। দুই গোত্রের লোকদের মধ্যকার এই প্রীতিপূর্ণ বৈঠক তার নিকটে অসহ্য ছিল। কেননা উভয় গোত্রের মধ্যে যুদ্ধাবস্থা টিকিয়ে রেখে উভয় গোত্রের নিকটে অস্ত্র বিক্রি ও সূদ ভিত্তিক ঋণদান ব্যবসা চালিয়ে আসছিল তারা দীর্ঘদিন ধরে। ইসলাম আসার পর এসব বন্ধ হয়েছে এবং তারা পুনরায় ভাই ভাই হয়ে গেছে। যাতে দারুণ আর্থিক ক্ষতির মধ্যে পড়ে যায় মদীনার কুসিদজীবী ইহুদী গোত্রগুলি।

ঐ বৃদ্ধ একজন যুবক ইহুদীকে উক্ত মজলিসে পাঠাল এই নির্দেশ দিয়ে যে, সে যেন সেখানে গিয়ে উভয় গোত্রের

মধ্যে ইতিপূর্বে সংঘটিত বু'আছ (بعـــاث) যুদ্ধ ও তার পূর্ববর্তী অবস্থা আলোচনা করে এবং ঐ সময়ে উভয় পক্ষ হ'তে যেসব বিদ্বেষমূলক ও আক্রমণাত্মক কবিতা সমূহ পঠিত হ'ত, তা থেকে কিছু কিছু পাঠ করে শুনিয়ে দেয়। যুবকটি যথারীতি তাই-ই করল এবং উভয় গোত্রীয় ছাহাবীদের মধ্যে লড়াইয়ের পরিবেশ তৈরী হয়ে গেল। এমনকি উভয় পক্ষ 'হার্রাহ' (الحـــرة) নামক স্থানের দিকে 'অস্ত্র অস্ত্র' (السلاح السلاح) বলতে বলতে বেরিয়ে গেল।

এ খবর পেয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কয়েকজন মুহাজির ছাহাবীকে সাথে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হ'লেন এবং সবাইকে শান্ত করলেন। তখন সবাই বুঝলেন যে, এটি শয়তানী প্ররোচনা (نزغة من الشيطان) ব্যতীত কিছুই নয়। তারা তওবা করলেন ও পরস্পরে বুক মিলিয়ে ক্রন্দন করতে লাগলেন। এভাবে শাস বিন ক্বায়েস ইহুদী শয়তানের জ্বালানো আগুন দ্রুত নিভে গেল।

(গ) **২য় হিজরীর ১৫ শাওয়াল বনু ক্বায়নুক্বার দুর্গ অবরোধ :** মদীনার তিনটি ইহুদী গোত্র বনু নাযীর, বনু কুরায়যা ও বনু ক্বায়নুক্বা। এদের মধ্যে শেষোক্তটি ছিল সর্বাধিক শক্তিশালী, সম্পদশালী ও মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ। বদর যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে নানাবিধ কষ্টদায়ক ও বিদ্রূপাত্মক আচরণ শুরু করে। এমনকি মুসলিম মহিলাদের নিয়েও তারা উপহাস করতে কসুর করত না। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং একদিন তাদের বাজারে উপস্থিত হ'লেন ও তাদের ডেকে নানাভাবে উপদেশ দিলেন। অবশেষে বললেন, يا معـــشر اليهـــود اسلموا قبل أن يصيبكم مثل ما اصاب قريشا– 'হে ইহুদী সম্প্রদায়! তোমরা অনুগত হও কুরায়েশদের ন্যায় অবস্থাপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই'। এতে তারা উত্তেজিত হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! তুমি কিছু কুরায়েশকে হত্যা করে ধোঁকায় পড়ো না। ওরা আনাড়ী। ওরা যুদ্ধবিদ্যার কিছুই জানে না। যদি তুমি আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর, তবে তুমি আমাদের মত কাউকে পাবে না'। এরূপ কথা শুনেও পূর্বের সন্ধিচুক্তির কারণে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) সংযত রইলেন।

এরপর থেকে তারা চক্রান্ত ও হাঙ্গামার মাত্রা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং একদিন তারা এমন এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসে যা উভয় পক্ষের সংঘাতকে অপরিহার্য করে তোলে।-

আবু আওন সূত্রে ইবনে হেশাম বর্ণনা করেন যে, একদিন জনৈকা মুসলিম মহিলা বনু ক্বায়নুক্বার বাজারে দুধ বিক্রি করে বিশেষ কোন প্রয়োজনে এক ইহুদী স্বর্ণকারের দোকানে গিয়ে বসেন। তখন কতগুলো দুষ্টমতি ইহুদী তার মুখের অবগুণ্ঠন খুলতে চায়। কিন্তু তিনি অস্বীকার করেন। তখন ঐ স্বর্ণকার ঐ মহিলার অগোচরে তার কাপড়ের এক প্রান্ত তার পিঠের উপরে গিরা দেয়। কাজ শেষে মহিলা উঠে দাঁড়াতেই কাপড়ে টান পড়ে বিবস্ত্র হয়ে পড়েন। দুবৃত্তরা তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। এতে মহিলাটি লজ্জায় ও ক্ষোভে চিৎকার করে ওঠেন। এমতাবস্থায় একজন মুসলমান ঐ স্বর্ণকারের উপরে লাফিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করে ফেলেন। প্রত্যুত্তরে এক ইহুদী ঝাঁপিয়ে পড়ে মুসলমানটিকে হত্যা করে। ফলে সন্ধি ভঙ্গ হয় এবং সংঘাত বেধে যায়। ২য় হিজরীর ১৫ই শাওয়াল শনিবারে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সসৈন্যে তাদের দুর্গ অবরোধ করেন ও দু'সপ্তাহ অবরোধের পর তারা আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর তিনি তাদেরকে মদীনা হ'তে চিরদিনের মত বিতাড়িত করেন। তারা সিরিয়া অঞ্চলে হিজরত করে এবং কিছু দিনের মধ্যেই তাদের অধিকাংশ সেখানে মৃত্যু বরণ করে।

(ঘ) ৩য় হিজরীর ১৪ই রবীউল আউয়াল; কা'ব বিন আশরাফের হত্যাকাণ্ড : কা'ব বিন আশরাফ ছিল একজন খ্যাতনামা ইহুদী পুঁজিপতি, কবি ও চরম মুসলিম বিদ্বেষী। তার দুর্গটি ছিল মদীনার পূর্ব-দক্ষিণে দু'মাইল দূরে বনু নাযীর গোত্রের পশ্চাদভূমিতে। বদর যুদ্ধে কুরায়েশ নেতাদের চরম পরাজয়ে সে রাগে-দুঃখে ফেটে পড়তে থাকে এবং রাসূলের ও মুসলমানদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে ও কুরায়েশ নেতাদের প্রশংসা করে কবিতা বলতে থাকে। কিন্তু তাতে তার ক্ষোভের আগুন প্রশমিত না হওয়ায় সে মক্কায় চলে যায় এবং কুরায়েশ নেতাদের কবিতার মাধ্যমে উত্তেজিত করতে থাকে। সে যুগে কবিতাই ছিল সাহিত্যের বাহন এবং কারু প্রশংসা বা ব্যঙ্গ করার প্রধান হাতিয়ার। কোন বংশে কোন কবি জন্মগ্রহণ করলে সে বংশ তাকে নিয়ে গর্ব করত এবং তাকে সৌভাগ্যের প্রতীক মনে করা হ'ত। আবু সুফিয়ান এবং মক্কার নেতারা তাকে জিজ্ঞেস করল أديننا أحب إليك أم دين محمـــد وأصـــحابه وأي الفريقين أهـــدى ســـبيلا؟ 'আমাদের দ্বীন তোমার নিকটে অধিক প্রিয় না মুহাম্মাদ ও তার সাথীদের দ্বীন? এবং এ দু'টি দলের মধ্যে কোন দলটি অধিক সুপথপ্রাপ্ত? সে বলল, أنتم أهدى منهم سبيلا وأفـــضل 'তোমরাই তাদের চাইতে অধিক সুপথপ্রাপ্ত ও উত্তম'। এ প্রসঙ্গে সূরা নিসা ৫১

আয়াতটি নাযিল হয়। এরপর সে মদীনা ফিরে এসে একই রূপ আচরণ করতে থাকে। এমনকি ছাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীদের নামে কুৎসা রটনা করতে থাকে ও নানাবিধ ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বলতে থাকে। এতে অতিষ্ঠ হয়ে একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, من لكعب بن الأشرف فإنـــه أذى الله ورســـوله– 'কা'ব বিন আশরাফকে হত্যা করার জন্য কে আছ? কেননা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দিয়েছে'। তখন আউস গোত্রের মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামাহ্র নেতৃত্বে আব্বাছ বিন বিশর ও কা'ব বিন আশরাফের দুধভাই আবু নায়েলাহ সহ পাঁচ জন প্রস্তুত হয়ে গেলেন। দলনেতা মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ কার্য সিদ্ধির জন্য কিছু প্রতারণামূলক কথা ও কাজের আশ্রয় নেবার অনুমতি চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে অনুমতি দেন।

সে মোতাবেক প্রথমে মুহাম্মাদ ও পরে আবু নায়েলা কা'বের কাছে গিয়ে রাসূলের বিরুদ্ধে অনেক কথার মধ্যে একথাও বলল যে, এ লোক আমাদেরকে দারুণ কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। এই ব্যক্তি আমাদের কাছে ছাদাক্বাহ চাচ্ছে। আমরা আমাদের পরিবার-পরিজনের কষ্ট নিবারণের জন্য আপনার নিকটে কিছু খাদ্য-শস্য কামনা করছি। কা'ব কিছু বন্ধকের বিনিময়ে দিতে রাযী হ'ল। প্রথমে নারী বন্ধক, অতঃপর পুত্র বন্ধক, অবশেষে অস্ত্র বন্ধকের ব্যাপারে নিষ্পত্তি হ'ল। আবু নায়েলাহ বলল, আমারই মত কষ্টে আমার কয়েকজন বন্ধু-বান্ধব আছে। আমি তাদেরকেও আপনার কাছে নিয়ে আসব। আপনি তাদেরও কিছু খাদ্য-শস্য দিয়ে অনুগ্রহ করুন। অতঃপর পূর্ব সিদ্ধান্ত মতে ৩য় হিজরীর রবীউল আউয়াল মাসের ১৪ তারিখের চাঁদনী রাতে মুহাম্মাদ বিন মাসলামাহ তার দলবল নিয়ে কা'বের বাড়ীতে গেলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে বাকী'এ গারক্বাদ পর্যন্ত এগিয়ে দেন এবং বলেন, انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم– 'আল্লাহ্র নামে অগ্রসর হও। হে আল্লাহ তুমি এদের সাহায্য কর'। অতঃপর তিনি বাড়ী ফিরে এসে ছালাত ও দো'আয় রত হ'লেন।

দুধভাই আবু নায়েলাহ কা'বের দুর্গদ্বারে দাঁড়িয়ে ডাক দিল। এ সময় কা'বের নববধূ তাকে বাধা দিয়ে বলল, أسمع صوتا كأنه يقطر منه الـــدم 'আমি এমন এক ডাক শুনলাম, মনে হ'ল তা থেকে রক্তের ফোঁটা ঝরছে'। কিন্তু কা'ব কোনরূপ সন্দেহ না করে বলল, এরা তো আমার ভাই। তাছাড়া إن الكريم لو دعـــى إلى طعنـــة أجـــاب– 'সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যদি তরবারির দিকেও আহূত হন, তথাপি তিনি তাতে সাড়া দিয়ে থাকেন'। অতঃপর সে বেরিয়ে এলো। তারপর সকলে মিলে কিছু দূর এগিয়ে যেতেই পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক তাকে শেষ করে ফেলা হ'ল।

কাজ সেরে তার মাথা নিয়ে বাক্বীয়ে গারক্বাদে ফিরে এসে তারা জোরে তাকবীর ধ্বনি করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও তাকবীর ধ্বনি করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন এবং খুশী হয়ে বলেন, أفلحت الوجوه 'তোমাদের চেহারাগুলি সফল থাকুক'। তারাও বললেন, ووجهك يا رســـول الله 'এবং আপনার চেহারাও হে আল্লাহ্র রাসূল'! এ সময় ঐ দুষ্টের কাটা মাথাটা তার সামনে রাখা হ'লে তিনি 'আলহামদুলিল্লাহ' পাঠ করেন।

কা'ব বিন আশরাফকে গোপনে হত্যা করায় প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের স্বার্থে এরূপ দুশমনকে গুপ্তহত্যা করা চলে। দ্বিতীয় আরেকটি বিষয় প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ ও রাসূলের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী ও অপপ্রচারকারীর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। মুসলিম মহিলাদের ইয্যত নিয়ে কুৎসা রটনাকারীদের জন্য একই শাস্তি নির্ধারিত। এই ধরনের দুশমন নির্মূল করার জন্য প্রয়োজন বোধে প্রতারণার আশ্রয় নেয়া যাবে। তবে এ ধরনের সবকিছুতে সর্বোচ্চ সরকারী নির্দেশ আবশ্যিক হবে। এককভাবে কারু জন্য এরূপ করা সিদ্ধ নয়। *[ক্রমশঃ]*

---

১৫. *সীরাতে ইবনে হিশাম ২/৫১-৫৭; বুখারী হা/৪০৩৭ 'যুদ্ধ-বিগ্রহ' অধ্যায় ১৫ অনুচ্ছেদ; মুসনাদে আহমাদ হা/২৩৯১; ইরওয়া হা/১১৯১।*

ফৎওয়া : গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ

*শিহাবুদ্দীন আহমাদ**

ভূমিকা :

আল্লাহ মানবজাতিকে কেবল তাঁরই ইবাদত করার জন্য সৃষ্টি করেছেন' *(যারিয়াত ৫৬)*। মানব সৃষ্টির এই মৌলিক উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন এবং মানবজাতির পার্থিব জীবন পরিচালনার জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যুগে যুগে অসংখ্য নবী-রাসূল প্রেরণ করেছেন, যাদের মাধ্যমে তিনি মানবসমাজের জন্য প্রেরণ করেছেন আসমানী কিতাব তথা স্বীয় বিধি-বিধান। সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত দায়-দায়িত্ব পালন করতে হ'লে মানুষকে অবশ্যই এ সকল আসমানী নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হ'তে হয়। নবী-রাসূলগণ তাঁদের জীবদ্দশায় নিজেরাই দ্বীনের খুঁটিনাটি সকল বিষয় ব্যাখ্যা করেছেন এবং মানব সমাজে তা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন। তাঁদের অবর্তমানে এ দায়িত্ব পালন করেন উম্মতের সেসকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ যারা দ্বীন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান রাখেন। আলোচ্য প্রবন্ধে ফৎওয়ার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা ও বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে।

ফৎওয়ার শাব্দিক বিশ্লেষণ :

فَتوى 'ফৎওয়া' বা فُتــوى 'ফুৎওয়া' আরবী শব্দ এবং এটি একবচন; বহুবচনে فَتَاوَى 'ফাতাওয়া' বা فَتَاوِى 'ফাতাবী', যার অর্থ 'ফক্বীহ কর্তৃক অভিমত'। কোন কোন অভিধানবিদের মতে ইহা الفَتْــوة শব্দ হ'তে গৃহীত হয়েছে, যার অর্থ করা হয় অনুগ্রহ, বদান্যতা, দানশীলতা, মনুষ্যত্ব ও শক্তি প্রদর্শন।[১৫]

মূলতঃ فَتْــوى শব্দটি فَتْــى মূল ধাতু থেকে নির্গত। একই মূলধাতু থেকে নির্গত فتوى (ফাৎওয়া)-কে فُتْيَــا (ফুৎইয়া) অর্থাৎ فــا অক্ষরকে পেশ দিয়ে পড়া যায়। আরবী ভাষায় ফৎওয়া শব্দটি ফুৎইয়া হিসাবেই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ইবনু মানযূর 'লিসানুল আরব' অভিধানে উল্লেখ করেছেন, الفَتْوى والفُتْيَا إسمان يوضعان من موضع الإفتاء إلا أن لفظة الفُتيَا أكثر استعمالاً فى كلام العرب من لفظة الفتــوى. 'ফৎওয়া (فَتْــوى) এবং ফুৎইয়া (فُتْيَــا) দু'টি বিশেষ্যকে ইফতা (إفتاء) শব্দের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

তবে আরবী ভাষায় ফৎওয়া (فَتْوى) শব্দের তুলনায় ফুৎইয়া (فُتْيَــا) শব্দটিই বেশী ব্যবহৃত হয়ে থাকে।[১৬] আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, الفتوى إســم مصدر بمعنى الإفتاء ويقال : أفتيته فتوى وفتيا إذا أجبته عن مسألته، والفتيا تبيين المشكل من الاحكــام. 'ইফতা অর্থে ফৎওয়া শব্দটি ক্রিয়ামূল। যেমন কারো কোন প্রশ্নের উত্তর দিলে বলা হয়, أفتيته فتــوى وفتيــا 'আমি তাকে ফৎওয়া প্রদান করেছি'। জটিল বিধি-বিধান বর্ণনা করাকে ফুৎয়া বলা হয়। মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উছমানী বলেন, الفتوى والفتيا كلاهما إسمان يستعملان كأصل مصدر من قولهم : أفتى يفتى إفتاء: معناه فى اللغة: الإجابة عن سؤال ما كان متعلقــا بالأحكــام الــشرعية أو بغيرهــا، 'ফৎওয়া ও ফুৎয়া শব্দ দু'টিই ক্রিয়ামূল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয়, أفتى يفتى إفتــاء এর শাব্দিক অর্থ হ'ল, শারঈ বিধি-বিধান বা অন্য বিষয়ে প্রশ্নের জবাব প্রদান করা'।[১৭]

প্রসিদ্ধ ৯টি হাদীছ গ্রন্থে ফুৎইয়া (فُتْيا) শব্দটি মোটামুটি ৩০ বার উল্লেখিত হয়েছে। যেমন- ছহীহ মুসলিমে ৪ বার, মুসনাদে আহমাদে ১২ বার, সুনানু আবী দাঊদে ৩ বার, সুনানু নাসাঈতে ২ বার, সুনানু ইবনে মাজাহতে ২ বার ও সুনানুদ দারেমীতে ৭ বার এসেছে। উল্লেখিত গ্রন্থ সমূহে فَتْــوى (ফৎওয়া) শব্দের উল্লেখ নেই। তবে অর্থ ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে فَتْوى (ফৎওয়া) এবং فُتيا (ফুৎইয়া) শব্দ দু'টি এক ও অভিন্ন এবং উভয়ের ব্যবহার শুদ্ধ।[১৮]

ফৎওয়ার পারিভাষিক অর্থ :

বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টিতে, ফৎওয়া বলতে বুঝায়, কারো জিজ্ঞাসার জবাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা।[১৯]

১. মুফতী তাকী ওছমানী ফৎওয়ার সংজ্ঞায় বলেন, 'দ্বীন ইসলাম সম্পর্কিত কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তর দেয়া'।[২০]

২. ড. আব্দুছ ছবুর মারযূক বলেন, هي بيان الحكم الشرعي فى مسألة من المسائل ، مؤيَّداً بالدليل من القرآن الكريم ،

* *পিএইচ.ডি গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১৫. ইসলামী বিশ্বকোষ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৩ ইং), পৃঃ ৫৩৪।

১৬. ইবন মানযূর, লিযানুল আরব, ৫ম খণ্ড (বৈরুত : দারু এহইয়াইত তুরাছিল আরাবী), পৃঃ ২০।

১৭. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উছমানী, উছূলুল ইফতা (ঢাকা : মাকতাবাতু শায়খুল ইসলাম, ২০০৭), পৃঃ ৯।

১৮. অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ফাতওয়া : সংজ্ঞা, গুরুত্ব ও ফাতওয়া দানের যোগ্যতা (ঢাকা : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২০১০), পৃঃ ৬-৭।

১৯. ফতওয়া : গুরুত্ব ও প্রয়োজন, সম্পাদনা, আব্দুল মান্নান তালিব, (ঢাকা : ইসলামিক ল রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ, ২০০১), পৃঃ ৩৪।

২০. মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উছমানী, উছূলুল ইফতা, পৃঃ ৯।

أو السنة النبوية ، أو الاجتهاد. 'কোন মাসআলায় শরী'আতের হুকুম কি তা বর্ণনা করা, যা পবিত্র কুরআন, সুন্নাহ অথবা ইজতিহাদের আলোকে সমাধা করা হয়।[২১]

৩. ইমাম রাগিব এর মতে ফৎওয়া হ'ল, والفُتْيا والفَتْوى الجواب عما يُشكِلُ من الأحكام، ويقال: استفتيته فأفتانى بكذا. 'জটিল বিষয়ের সুষ্ঠু সমাধান দেওয়ার নামই ফৎওয়া বা ফুৎয়া। যেমন- বলা হয় আমি তার কাছে ফৎওয়া জানতে চেয়েছি এবং তিনি আমাকে এরূপ ফৎওয়া দিয়েছেন'।[২২]

৪. মুফতী আমীমুল ইহসান বলেন, الفتوى : هو الحكم الشرعى يعنى ما أفتى به العالم وهى اسم ما أفتى العالم به إذا بيّن الحكم. 'ফৎওয়া হচ্ছে শারঈ হুকুম, অর্থাৎ একজন আলিম যার দ্বারা জবাব দেন। কোন আলিম শরী'আতের কোন হুকুম বর্ণনা করলে সে হুকুমকে ফৎওয়া বলা হয়।[২৩]

৫. আল-মাউসূ'আতুল ফিক্বহিয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, الفتوى في الاصطلاح : تبيين الحكم الشرعي عن دليل لمن سأل عنه وهذا يشمل السؤال في الوقائع وغيرها– 'কোন ব্যক্তির জিজ্ঞাসার জবাবে দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে শরী'আতের বিধান সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করাকে ফৎওয়া বলা হয়। সে প্রশ্ন সমসাময়িক সমস্যা বা অন্য যে কোন প্রসঙ্গে হতে পারে'।

একজন মুফতী এবং একজন বিচারকের মধ্যে পার্থক্য হ'ল– মুফতী কেবল শরী'আতের বিধান জানিয়ে দেন; তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব তার নয়, আর বিচারক ফৎওয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত হুকুমের প্রয়োগ সুনিশ্চিত করেন। আদালতের রায় হচ্ছে প্রয়োগযোগ্য ও বাধ্যতামূলক, অপরদিকে ফৎওয়া হচ্ছে উপদেশমূলক। বিচারক ও মুফতী উভয়ই শরী'আতের ব্যাখ্যা প্রদান করেন, কিন্তু বিচারকের কাজের লক্ষ্য থাকে সাক্ষ্য-প্রমাণাদির পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে কি-না তা দেখা, আর মুফতীর লক্ষ্য থাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র মূলসূত্র অনুসন্ধান করা। একজন মুজতাহিদের সাথে মুফতীর পার্থক্য হল– মুজতাহিদ গবেষণার মাধ্যমে শারঈ হুকুম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করেন এবং মুফতী প্রশ্নকারীর প্রশ্নের প্রেক্ষিতে জবাব জানিয়ে দেন।[২৪]

২১. রাশেদ আল-বিদাহ, আল ফাৎওয়া বি গায়রি ইলম (রিয়ায : ১৪২৮ হিঃ), পৃ: ২৫।
২২. রাগিব ইস্পাহানী, আল-মুফরাদাতু ফী গারীবিল কুরআন (বৈরূত : দারুল মা'রিফাহ, ১৪২০ হিঃ/১৯৯৯ খৃঃ), পৃঃ ৩৭৫।
২৩. মুফতী সাইয়েদ মুহাম্মাদ আমীমুল ইহসান, কাওয়ায়েদুল ফিক্বহ (দেওবন্দ : আশরাফিয়া বুক ডিপো, ১৯৯১), পৃ: ৪০৭।
২৪ আল-ফাৎওয়া বি গায়রি ইলম, পৃঃ ২৫-২৬।

ফৎওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা :

শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের যে বিধান নিয়ে আগমন করেছেন তা পূর্বের অন্যান্য সমস্ত নবী ও রাসূল অপেক্ষা তুলনাহীনভাবে সামগ্রিক ও সর্বব্যাপী। এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা যায় : (ক) নবী ও রাসূল হিসাবে তিনি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাঁর আগমনের মাধ্যমেই অহী আগমনের ধারা পরিসমাপ্ত হয়েছে। (খ) পূর্বের সমস্ত নবী-রাসূলের উম্মতের চাইতে এককভাবে তাঁর উম্মতই অনেক বেশী সংখ্যক। (গ) শেষ নবী হিসাবে তাঁর বিধানই ক্বিয়ামত পর্যন্ত চূড়ান্ত। (ঘ) তাঁর আনীত বিধান দ্বারা পূর্বের সমস্ত বিধান রহিত ও বাতিল হয়ে গেছে। অর্থাৎ রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছই ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানুষের জীবন পরিচালনার চূড়ান্ত সংবিধান। এখান থেকেই মানব জীবনে ফৎওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

সাধারণভাবে ফৎওয়া বলতে বুঝায়- 'আইন ও ধর্ম থেকে উদ্ভূত কোন বিষয়ের উপর উত্থাপিত প্রশ্নের স্বব্যাখ্যাত জবাব'। অর্থাৎ দ্বীন ইসলামের শারঈ বিষয়ে যেকোন প্রশ্নের দলীলভিত্তিক জওয়াবই ফৎওয়া। একটু লক্ষ্য করলেই বুঝা যায় মানবজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে ফৎওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণভাবে প্রযোজ্য। কেননা ফৎওয়ার বিষয়বস্তুই হ'ল– মানুষের প্রাত্যহিক দ্বীনী অনুশাসন, রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও আইন-আদালতকে পরামর্শ প্রদান এবং ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাদান। তাই ফৎওয়া ছাড়া ইসলামী জীবনব্যবস্থা কল্পনাও করা যায় না। আধুনিক কালে সমাজ, রাষ্ট্র ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলো ব্যাপকতা লাভের প্রেক্ষিতে বিষয়টি যে সমধিক গুরুত্ব নিয়ে বিকাশ লাভ করেছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) মুফতীকে 'আল্লাহ্র পক্ষে স্বাক্ষরকারী' অভিহিত করে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন'-এর নামকরণ করেছেন। এই গ্রন্থের ভূমিকায় ফৎওয়ার গুরুত্ব বর্ণনায় তিনি উল্লেখ করেছেন– وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذى لاينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من اعلى مراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسماوات. সাধারণত: একজন রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষে কৃত স্বাক্ষরকে অত্যন্ত গুরুত্ব ও মর্যাদা দেয়া হয়। সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনে তাকে রাখা হয়। তাহলে আকাশ-যমীনের রাজাধিরাজের পক্ষ থেকে স্বাক্ষরের মর্যাদা কেমন হ'তে পারে!!' [২৫]

২৫. ইবনুল ক্বাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন (বৈরূত : দারুল জীল, ১৯৭৩ ইং), ১/১০ পৃঃ।

ফৎওয়ার ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের মাধ্যমে লক্ষ্য করা যায় যে, ফৎওয়া প্রদান তথা দ্বীনের বিধান বর্ণনার কাজ প্রথমত: মহান আল্লাহই করেছেন। অতঃপর তাঁর প্রেরিত অহীকে মানবসমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন নবী-রাসূলগণ এবং সবশেষে আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ); যার মাধ্যমে পরিসমাপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ হয়েছে অহী অবতরণের সুদীর্ঘ ধারা। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর তাঁর উম্মত তথা ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ), তাবেঈ ও তাবা তাবেঈগণ এ দায়িত্ব নিরবচ্ছিন্নভাবে পালন করেছেন। অতঃপর দ্বীনী বিষয়ে গবেষণাকারী মুজতাহিদগণের মাধ্যমে অদ্যাবধি এ সিলসিলা চালু রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা চালু থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ফৎওয়ার অসামান্য গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে সাথে ফৎওয়া প্রদানে ঝুঁকিও রয়েছে সীমাহীন। কেননা ফৎওয়া প্রদানকারী ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে দ্বীন সংক্রান্ত বিষয়টি বর্ণনা করে থাকেন। হালাল-হারাম ব্যক্ত করে থাকেন। অসতর্কতাবশত যদি তার পক্ষ থেকে কোন ভুল সিদ্ধান্ত আসে তবে তাতে দ্বীনের বিধান ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়। সে কারণে ছাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী ইসলামী শরী'আত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ সহজে ফৎওয়া প্রদানের কাজে জড়িত হ'তে চাইতেন না। আবার ইলম গোপন করার আশংকা ও জবাবদিহিতার ভয়ে ফৎওয়া প্রদান হ'তে দূরেও থাকতে পারতেন না।[২৬] সুতরাং ইলম ও যোগ্যতা ছাড়া ফৎওয়া প্রদান কোনক্রমেই বৈধ নয়। দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, আজ ইলমহীন অজ্ঞ-অযোগ্য ব্যক্তিদের ফৎওয়ার কারণেই দ্বীনের বিধানগত বিষয় নিয়ে মুসলিম সমাজে এত মতানৈক্য, দ্বন্দ্ব ও কলহ-বিবাদ। মাযহাব, তরীকা ও রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভক্তির কারণে মুফতীদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর পক্ষে ফৎওয়া প্রদানও দ্বীনের মাঝে চরম বিভক্তি সৃষ্টিতে কম ভূমিকা রাখেনি। তাই অনিবার্য কারণেই একদল যোগ্যতাসম্পন্ন মুসলিমকে ইখলাছের সাথে এ কাজে নিয়োজিত থাকা আবশ্যক। নতুবা ইসলামী শরী'আতের ভিত্তি শিথিল হয়ে পড়বে এবং সমাজে দ্বীনে ইসলামের বিশুদ্ধরূপ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তৈরী হবে প্রতিবন্ধকতার পাহাড়। মোদ্দাকথা, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানাবিধ সমস্যা কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে সমাধান করে ইসলামের অবিমিশ্র রূপ জনসম্মুখে তুলে ধরার ক্ষেত্রে ফৎওয়ার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

ফৎওয়ার মৌলিক উৎস :

প্রতিটি বিষয়েরই উৎপত্তিস্থল বা উৎস থাকে। ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হচ্ছে ফৎওয়া বা জিজ্ঞাসার জওয়াব, যাকে অনুসরণ করে একজন মুসলিম তাঁর সার্বিক জীবন পরিচালনা করে থাকে। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এর উৎস অবশ্যই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ বা হাদীছ; এতদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নয়।[২৭] কেননা এ দু'টিই হ'ল অভ্রান্ত সত্যের উৎস আল্লাহ প্রদত্ত অহী, যার অনুসরণ করাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অপরিহার্য করেছেন। এ দু'টি উৎসের ভিত্তিতে জীবন সমস্যার সমাধান করার জন্যই ফৎওয়ার উৎপত্তি।

অবশ্য রায়পন্থী ওলামাগণ ফৎওয়ার উৎস হিসাবে পবিত্র কুরআন ও হাদীছের সাথে 'ইজমা' ও 'ক্বিয়াস' নামক দু'টি নীতিও যুক্ত করেছেন। তবে ইসলামের মূল দুই উৎসের সাথে একই কাতারে ইজমা ও ক্বিয়াসকে নিয়ে আসা কখনই সমীচীন নয়।

আর পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন বিধান সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ না পাওয়া গেলে সে ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহ্র সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোর আলোকে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, তাকে বলা হয় ইজতিহাদ। অর্থাৎ যুগ-জিজ্ঞাসার জওয়াব খুঁজে বের করার জন্য (যা সরাসরি কুরআন ও হাদীছে সরাসরি পাওয়া যায় না) পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সামনে রেখে গবেষণার মাধ্যমে সঠিক জওয়াব খুঁজে বের করাকেই ইজতিহাদ বলা হয়। যা ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল যোগ্য ও অভিজ্ঞ আলেমগণের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।[২৮]

ফৎওয়ার উৎপত্তি ও বিকাশ :

মানব জীবন সমস্যার সমাধানে পবিত্র কুরআনেই সর্বপ্রথম দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ফৎওয়া প্রদানের দৃষ্টান্ত রয়েছে অনেক। পবিত্র কুরআনে সরাসরি ফৎওয়া শব্দটি ৯টি আয়াতে মোট ১১ বার এসেছে।[২৯] এভাবে পবিত্র কুরআনের মাধ্যমেই ফৎওয়ার উৎপত্তি সূচিত হয়েছে। অতঃপর ফৎওয়ার বিকাশ সাধন হ'তে থাকে দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসার ও পরিব্যাপ্তি লাভের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে।

এক্ষণে ফৎওয়ার উৎপত্তি ও বিকাশধারাকে স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে মোটামুটি পাঁচটি যুগে ভাগ করা যায়। যথা : (ক) রাসূল (ছাঃ)-এর যুগ (খ) ছাহাবায়ে কেরামের যুগ (গ) তাবেঈ ও তাবা-তাবেঈদের যুগ (ঘ) আব্বাসীয় যুগ (ইমামগণের যুগ) (ঙ) আধুনিক যুগ। নিম্নে প্রতিটি যুগ সংক্ষেপে আলোচিত হ'ল।-

২৬. ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা (বৈরূত : দারু ছাদের, ১ম প্রকাশ : ১৯৬৮ ইং), ৬/১১০ পৃঃ।

২৭. ফাতওয়া : সংজ্ঞা, গুরুত্ব, পৃঃ ১১।

২৮. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন কি ও কেন? (রাজশাহী : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৬), পৃঃ ২০।

২৯. মুহাম্মাদ ফুওয়াদ আব্দুল বাকী, আল-মু'জামুল মুফাহরাস লি-আলফাযিল কুরআনিল কারীম (কায়রো : দারুল হাদীছ, ১৪১৭/১৯৯৬), পৃঃ ৬২৩।

রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে ফৎওয়া :

ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআনের মাধ্যমে ফৎওয়া প্রদান করেছেন।[৩০] আর রাসূল (ছাঃ) তা প্রচার করেছেন। যেমন ফৎওয়া প্রসঙ্গে আল্লাহ্র নিজস্ব ভাষা হ'ল- يَسْتَفْتُوْنَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِـــي الْكَلاَلَـــةِ. 'তারা আপনার কাছে ফৎওয়া জানতে চায়, অতএব আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে 'কালালাহ' (পিতৃহীন ও নিঃসন্তান)-এর মীরাছ সংক্রান্ত ফৎওয়া দিচ্ছেন' *(নিসা ১৭৬)*। তিনি আরো বলেন, يَسْتَفْتُوْنَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيْكُمْ فِـــيْهِنَّ 'তারা আপনার কাছে নারীদের (বিবাহ) সম্পর্কে জানতে চায়। আপনি বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট বলে দিচ্ছেন' *(নিসা ১২৭)*।

পবিত্র কুরআনের সাথে সাথে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ ভাষাতেও ফৎওয়া প্রদান করেছেন, যাকে আমরা হাদীছ বলে থাকি। রাসূল (ছাঃ)-এর বাণী তথা হাদীছ মূলত: অহী। যার অর্থ ও ভাব আল্লাহ্র; কেবল ভাষা রাসূল (ছাঃ)-এর। ইসলামী বিধি-বিধানের কোন একটি কথাও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের পক্ষ থেকে বলেননি, যা কিছু বলেছেন তার সবকিছুই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েই বলেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوحَى. 'তিনি মনগড়া কথা বলেন না। যা বলেন, তা তাঁর কাছে অবতীর্ণ (অহী) প্রত্যাদেশ ছাড়া আর কিছুই নয়' *(নাজম ৩-৪)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআনের কোন আয়াতের ফৎওয়া সুস্পষ্ট না হয়ে থাকলে তার ব্যাখ্যা নিজেই করেছেন এবং পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই এমন বিষয়েও তিনি ফৎওয়া দিয়েছেন এবং ছাহাবায়ে কেরাম তা সংরক্ষণ করেছেন। যা পরবর্তীতে হাদীছ হিসাবে সংরক্ষিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় তৎকালীন ইসলামী রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থলে তিনি ব্যতীত আর অন্য কেউ ফৎওয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন না।[৩১] তবে তিনি কিছু সংখ্যক যোগ্য, অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী ছাহাবীকে ফৎওয়া প্রদান ও বিচারকার্য পরিচালনা করার অনুমতি দিয়ে দূরবর্তী বিভিন্ন স্থানে প্রেরণ করেন। যেমন ১০ম হিজরীতে মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে বিচারক হিসাবে ইয়ামানে প্রেরণ করেন।[৩২]

[চলবে]

৩০ . মুহাম্মাদ আলী আস-সাইস, তারীখুল ফিক্বহ আল-ইসলামী (বৈরূত : দারুল ফিকর, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃঃ ৩৩-৩৪; আবু ছাইদ মোহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ (ঢাকা : ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯৭), পৃঃ ২৪।

৩১. ইবনুল কাইয়িম, ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৭ ও ৮।

৩২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ; মিশকাত হা/১৭৭২।

পুনরুত্থান

*রফীক আহমদ**

'পুনরুত্থান' অর্থ পুনরায় উত্থান, পুনরায় উঠা, পুনঃপ্রাপ্ত জীবন, মৃত্যুর পর পুনঃপ্রাপ্ত জীবন, কবর হ'তে মৃতের উত্থান, পুনরায় জন্ম, নতুন জীবন, শাশ্বত জীবন লাভ ইত্যাদি। মূলতঃ পুনরুত্থানের প্রাথমিক স্তর জন্ম। অর্থাৎ জন্মের পর মৃত্যু আর মৃত্যুর পরে মানুষ পুনরুত্থিত হবে। মানব জাতির জন্য পুনরুত্থানে বিশ্বাস স্থাপন ঈমানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। যারা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করে না তারা আল্লাহ তা'আলার প্রতিও বিশ্বাস রাখে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা বিপুলায়তনের নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। মানুষ তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রাণী। মহান রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানব জাতিকে পৃথিবীতে জীবন যাপনের জন্য সাময়িক সুব্যবস্থা করে দিয়েছেন মাত্র। অতঃপর পৃথিবীতে তার নির্ধারিত বয়স শেষ হয়ে গেলে, আল্লাহ্র আদেশে তার মৃত্যু হবে। অতঃপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে এবং সকল মানুষকে বিচারের জন্য পুনরুত্থিত করা হবে। এই পুনরুত্থান আল্লাহ তা'আলার মহাশক্তির প্রমাণ। এর প্রতি বিশ্বাসীরা হবে সফলকাম। আর এর প্রতি অবিশ্বাসীরা হবে সেদিন চরম ক্ষতিগ্রস্ত। আলোচ্য নিবন্ধে তাই পুনরুত্থান সম্পর্কে মানুষকে সংশোধনের ন্যূনতম চেষ্টা করব।

আসলে উত্থান ও পুনরুত্থানের মূল উপাদান 'আত্মা' হ'ল একটা অতি সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য বস্তু, যার হদীছ লাভ করা সমগ্র মানব জাতির পক্ষে অসম্ভব। এর মহানিয়ন্ত্রক হ'লেন আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং। পবিত্র কুরআনে পুনরুত্থানের নিশ্চয়তা প্রদানকারী বহু আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে। তন্মধ্যে সূরা আর-রূম-এর ১১নং আয়াতে অত্যন্ত সরল ও সহজভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, اللهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ ثُمَّ إِلَيْـــهِ تُرْجَعُـــوْنَ- 'আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, অতঃপর তিনি পুনরায় সৃষ্টি করবেন। এরপর তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে'।

একই মর্মার্থে আলোচ্য সূরায় মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُوْنَ- وَهُوَ الَّذِيْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ-

* শিক্ষক (অবঃ), বিরামপুর, দিনাজপুর।

'নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে যা কিছু আছে, সব তাঁরই। সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টিকে অস্তিত্বে আনয়ন করেন, অতঃপর পুনর্বার তিনি সৃষ্টি করবেন। এটা তাঁর জন্য সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই এবং তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(রূম ২৬, ২৭)*।

পুনরুত্থানের বিষয়টিকে আরও সহজভাবে বুঝানোর জন্য মহান আল্লাহ প্রত্যাদেশ করেন, مَا خَلْقُكُمْ وَلاَ بَعْثُكُمْ إِلاَّ كَنَفْسٍ وَّاحِدَةٍ إِنَّ اللهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ 'তোমাদের সৃষ্টি ও পুনরুত্থান, একটি মাত্র প্রাণীর সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের সমান বৈ নয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন' *(লোক্বমান ২৮)*।

আল্লাহ তা'আলা হ'লেন দৃশ্য ও অদৃশ্য জগতের সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, পালনকর্তা, রক্ষক ও সর্বময় কর্তা। আর একমাত্র মানব জাতিই এসব কিছু অনুধাবন করার যোগ্য। এদের জন্য একটা আইন-কানূন, একটা নিয়ম-প্রণালী, একটা বিধি-ব্যবস্থা ও একটা নির্ধারিত সময়সূচী রয়েছে। যারা উক্ত বিধি-বিধান ও নিয়ম-প্রণালী অনুযায়ী জীবন-যাপন করবে, তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী সুখ-শান্তির আলয় 'জান্নাত'। পক্ষান্তরে যারা বিরুদ্ধাচরণ করবে তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তির ব্যবস্থা 'জাহান্নাম'। অবশ্য শান্তি ও শাস্তি উভয় ক্ষেত্রেই আল্লাহ নিরপেক্ষ বিচার করবেন। আর এজন্যই ইহজগতের শেষে পুনরুত্থান ঘটিয়ে বিচারের জন্য সকলকে সমবেত করবেন। মহান আল্লাহ বলেন,

إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا وَعْدَ اللهِ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ آمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيْمٍ وَّعَذَابٌ أَلِيْمٌ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ-

'তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে তোমাদের সবাইকে, আল্লাহ্র ওয়াদা সত্য, তিনিই সৃষ্টি করেন প্রথমবার, আবার পুনর্বার তৈরী করবেন, তাদেরকে বদলা দেয়ার জন্য, যারা ঈমান এনেছে এবং নেক কাজ করেছে ইনছাফের সাথে। আর যারা কাফের হয়েছে, তাদের পান করতে হবে ফুটন্ত পানি এবং ভোগ করতে হবে যন্ত্রণাদায়ক আযাব, এজন্য যে তারা কুফরী করছিল' *(ইউনুস ৪)*।

এ সম্পর্কে অন্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে,

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ- قُلْ سِيْرُوْا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ-

'তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টিকর্ম শুরু করেন, অতঃপর তাকে পুনরায় সৃষ্টি করবেন? এটাতো আল্লাহ্র জন্য সহজ। বলুন, তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, কিভাবে তিনি সৃষ্টিকর্ম শুরু করেছেন। অতঃপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম' *(আনকাবূত ১৯, ২০)*।

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللهُ جَمِيْعاً فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا أَحْصَاهُ اللهُ وَنَسُوْهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ-

'সেদিন স্মরণীয়, যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে পুনরুত্থিত করবেন, অতঃপর তাদেরকে জানিয়ে দিবেন যা তারা করত। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আল্লাহ্র সামনে উপস্থিত আছে সব বস্তুই' *(মুজাদালাহ ৬)*। মহান আল্লাহ আরও বলেন,

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُوْلاً فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ-

'তিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে সুগম করেছেন, অতএব তোমরা তার কাঁধে বিচরণ কর এবং তাঁর দেয়া রিযিক আহার কর। তাঁরই কাছে পুনরুজ্জীবন হবে' *(মুল্ক ১৫)*।

আলোচ্য সূরায় ধর্মভীরু ও মুমিনদের প্রতি লক্ষ্য করে প্রত্যাদেশ হয়েছে যে, إِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ كَبِيْرٌ- 'নিশ্চয়ই যারা তাদের পালনকর্তাকে না দেখে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার' *(মুল্ক ১২)*।

পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ্র বাণী ক্বিয়ামত পর্যন্ত অকাট্য সত্য থাকবে। মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বোত্তম ও সর্বশেষ নির্দেশাবলী দ্বারা মানুষের প্রথমবার সৃষ্টি, অতঃপর মৃত্যু, অতঃপর পুনর্বার সৃষ্টির ওয়াদা উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া চলমান পৃথিবীর বুকে সৃষ্টি ও পুনঃসৃষ্টির বস্তুগুলি মনোযোগ সহকারে অবলোকন করার কথাও ইঙ্গিত করেছেন। উদাহরণ স্বরূপ অসংখ্য প্রাণীর জীবন-যাপন বা খাদ্য উপযোগী, অসংখ্য উদ্ভিদরাজি সূর্য কিরণে এক সময় শুকিয়ে বা পুড়ে মৃতপ্রায় হয়ে শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ্র হুকুমে বৃষ্টির পানিতে সেই মৃত যমীন পুনরায় শস্য-শ্যামল উদ্ভিদে ভরে যায়। এটাও মানুষের পুনরুত্থানের এক বড় নিদর্শন এবং বাস্তব কল্যাণের এক অপূরণীয় অবদান।

মৃত্যুর পর কবর হ'তে পুনরুত্থানের বন্দোবস্ত নিঃসন্দেহে মানব জাতির চিরস্থায়ী কল্যাণের উৎস। তবে সেটা

কেবলমাত্র আল্লাহ্র বিশ্বস্ত বান্দাদের জন্য প্রযোজ্য, অবিশ্বাসীদের জন্য মোটেও নয়। অবিশ্বাসীরা কখনও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী নয়, মৃত্যুই তাদের শেষ পরিণতি এবং পুনরুত্থান তাদের জন্য এক অলিক কল্পনার বস্তু। এ বিষয়ে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য হ'তে কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত কিংবা জাহান্নামস্থ ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয়। আর তাকে বলা হয়, এটাই তোমার বাসস্থান। ক্বিয়ামতে পুনরুত্থান পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে' *(বুখারী)*। অর্থাৎ প্রত্যেক বান্দাকে কবরস্থ করার পর, পুণ্যবানগণ জান্নাতের খোশখবর পান বা জান্নাতের সাথে তাদের কবরের যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। অপরদিকে পাপীরা জাহান্নামের ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সম্মুখীন হয় বা তাদের কবরের সাথে জাহান্নামের দরজা উন্মুক্ত করা হয়।

অপর এক হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'পৃথিবীতে আগন্তুক অথবা পথিকের ন্যায় জীবন-যাপন কর'। ইবনু ওমর প্রায়ই বলতেন, সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা কর না। আর সকাল পর্যন্ত (বেঁচে) থাকলে সন্ধ্যা পর্যন্ত (বেঁচে) থাকার আশা কর না এবং সুস্থতা থেকে রোগাক্রান্ত অবস্থার জন্য ও জীবন থেকে মৃত্যুর জন্য পাথেয় সঞ্চয় করো' *(বুখারী)*।

পবিত্র কুরআন ও হাদীছের এসব বাণী সমূহ অবগতির পরও অনেক বান্দা শয়তানের প্ররোচনায় ও নফসের প্রভাবে পুনরুত্থানের প্রতি অবিশ্বাসীই থেকে যায়। আল্লাহ তা'আলা এদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন যে, زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَن لَّنْ يُّبْعَثُوْا قُلْ بَلَى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرٌ– 'কাফেররা দাবী করে যে, তারা কখনও পুনরুত্থিত হবে না। বলুন, অবশ্যই হবে, আমার পালনকর্তার কসম, তোমরা নিশ্চয়ই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে অবহিত করা হবে যা তোমরা করতে। এটা আল্লাহ্র পক্ষে সহজ' *(তাগাবুন ৭)*।

পুনরুত্থান বিষয়ে কাফেরদের ধারণা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

قَالُوْا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا– قُل كُوْنُوْا حِجَارَةً أَوْ حَدِيْدًا– أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِيْ صُدُوْرِكُمْ فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا قُلِ الَّذِيْ فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُوْنَ إِلَيْكَ رُؤُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا– يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّوْنَ إِنْ لَّبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيْلاً–

'তারা বলে, যখন আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাব, তখনও কি নতুন করে সৃজিত হয়ে উত্থিত হব? বলুন, তোমরা পাথর হয়ে যাও কিংবা লোহা। অথবা এমন কোন বস্তু, যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন, তথাপি তারা বলবে, আমাদেরকে পুনর্বার কে সৃষ্টি করবে? বলুন, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তারা আপনার সামনে মাথা নাড়বে এবং বলবে, এটা কবে হবে? বলুন, হবে সম্ভবতঃ শ্রীঘ্রই। সেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন। অতঃপর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে চলে আসবে এবং তোমরা অনুধাবন করবে যে, সামান্য সময়ই (পৃথিবীতে) অবস্থান করেছিলে' *(বানী ইসরাঈল ৪৯-৫২)*।

কাফেরদের সম্বন্ধে মহান আল্লাহ অন্যত্র আরও বলেন,

وَأَقْسَمُوْا بِاللهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللهُ مَنْ يَّمُوْتُ بَلَى وَعْداً عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُوْنَ– لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِيْ يَخْتَلِفُوْنَ فِيْهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَنَّهُمْ كَانُوْا كَاذِبِيْنَ–

'তারা আল্লাহ্র নামে কঠোর শপথ করে যে, যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন না। অবশ্যই এর পাকাপোক্ত ওয়াদা হয়ে গেছে, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। তিনি পুনরুজ্জীবিত করবেনই, যাতে যে বিষয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য ছিল তা প্রকাশ করা যায় এবং যাতে কাফেররা জেনে নেয় যে, তারা মিথ্যাবাদী ছিল' *(নাহল ৩৮-৩৯)*।

মানব সৃষ্টির ইতিকথার বিবরণগুলি পর্যালোচনা করলে একমাত্র মানুষকেই সর্বশ্রেষ্ঠ, বুদ্ধিমান, চিরজীবি ও আল্লাহ্র নিকটতম প্রাণী হিসাবে পাওয়া যায়। এ নশ্বর পৃথিবীতে মানুষের আগমন, বিচরণ ও মৃত্যুবরণ মহা প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তা'আলার মহাক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ এবং মানুষের জ্ঞান আহরণের কেন্দ্রবিন্দু। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই মানুষকে কিছু সময়ের জন্য এ নশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেন, তাদের ভাল ও মন্দ কাজের হিসাব রাখেন, মৃত্যু ঘটান। অতঃপর পুনরুত্থানের মাধ্যমে অনন্ত জীবন দান করার ওয়াদা পূর্ণ করবেন। কিন্তু এই সুপ্রতিষ্ঠিত মহাসত্যের অভ্যন্তরে বিশৃংখলা ও অরাজকতা সৃষ্টির ধারণা নিয়ে শয়তানের আবির্ভাব হয়। শয়তান তার

মিথ্যা ভাষণ ও শপথ দ্বারা প্রথম অভিযানেই সাফল্য অর্জন করে। অতঃপর ধীরে ধীরে নিজের অবস্থান মজবুত করে নেয়। অথচ সে সর্বজন পরিচিত এক মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কিছুই নয়। শয়তান আবহমানকাল ধরে তার বিশ্বাসঘাতকতা, প্রতারণা, চাতুর্যপূর্ণ যুক্তি, কূটকৌশল, মিথ্যার আশ্রয় দ্বারা মানুষের মাঝে বিপ্লবের সূচনা ঘটিয়ে বিশ্বাসীর ভূমিকা পালন করে। শয়তানের এই অসামান্য প্রচেষ্টা তার শিষ্যবর্গের দ্বারা সাধারণ্যে সম্প্রচারিত হয় এবং কাফের সম্প্রদায়ের প্রসার ঘটে এবং তারা ইসলাম ধর্মের অন্যান্য বিধানাবলীর সঙ্গে পুনরুত্থানকেও অবিশ্বাস ও অস্বীকার করে। পুনরুত্থানের প্রতি কাফের সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসকে আল্লাহ তা'আলা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে বলেন, পুনরুত্থান হবেই। আর মানব জাতিকে চিরজীবন বা অনন্ত জীবন দানের জন্য পুনরুত্থানের ব্যবস্থা।

পুনরুত্থানের ঘটনা বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ- قَالُوْا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ- إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ-

'সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে, তখনই তারা কবর থেকে তাদের পালনকর্তার দিকে ছুটে চলবে। তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে নিদ্রাস্থল থেকে উত্থিত করল? রহমান আল্লাহ তো এরই ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্য বলেছিলেন। এটা তো হবে কেবল এক মহা নাদ। সে মুহূর্তেই তাদের সবাইকে আমার সামনে উপস্থিত করা হবে' *(ইয়াসীন ৫১-৫৩)*।

পুনরুত্থান সম্পর্কে অপর এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ- 'সেদিন (ক্বিয়ামতের দিন) আমি আকাশকে গুটিয়ে নেব, যেমন গুটানো হয় লিখিত কাগজপত্র। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব। আমার ওয়াদা নিশ্চিত, আমাকে তা পূর্ণ করতেই হবে' *(আম্বিয়া ১০৪)*।

এ বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَّنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُّحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيْمٌ- قُلْ يُحْيِيْهَا الَّذِيْ أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَّهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيْمٌ- 'মানুষ আমার সম্পর্কে এক অদ্ভুত কথা বর্ণনা করে, অথচ সে নিজের সৃষ্টি ভুলে যায়। সে বলে, কে জীবিত করবে অস্থি সমূহকে যখন সেগুলো পচে-গলে যাবে? বলুন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই জীবিত করবেন। তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত' *(ইয়াসীন ৭৮-৭৯)*।

পবিত্র কুরআনে মানুষের প্রথম সৃষ্টি এবং কবর হ'তে পুনরুত্থান উভয় সৃষ্টিকেই একটা পরিপূর্ণ ও সমান সৃষ্টিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। তবে প্রথম সৃষ্টির একটা সুদীর্ঘ ধারাবাহিকতা আছে। পুনরুত্থান বা দ্বিতীয় সৃষ্টিতে তা নেই, এটা পুনরুত্থান। হঠাৎ করে ও একই সময়ে সুসম্পন্ন হবে। সিংগায় ফুঁক দেওয়ার পরপরই পুনরুত্থান হবে। অবশ্য সিংগায় প্রথম ফুঁকে পৃথিবীর সব কিছু ধ্বংস হয়ে যাবে এবং সকল প্রাণী মৃত্যুবরণ করবে। অতঃপর সিংগার দ্বিতীয় ফুঁকে কবরস্থ সহ সকল মানব জীবিত হয়ে মহিমাময় আল্লাহ্র দিকে ছুটে চলবে।

মৃত্যু মানব জীবনের একটি সাময়িক বন্দোবস্ত মাত্র। অতঃপর পুনরুত্থানের মাধ্যমে দীর্ঘ জীবনের সূচনা। অবশ্য মৃত্যু ও পুনরুত্থান একটি অপরটির পরিপূরক। আবার মৃত্যুর বিভীষিকায় পুণ্যবানগণ কোন সমস্যার সম্মুখীন হয়নি, পুনরুত্থানেও তাদের সামনে কোন সমস্যা উত্থাপিত হবে না। কিন্তু পাপী মৃত্যুর বিভীষিকায় পুরোপুরি আক্রান্ত ও ক্ষতবিক্ষত হয়। পুনরুত্থানেও তাদের জন্য এক ভয়াবহ ও লোমহর্ষক পরিণতি অপেক্ষা করছে। আর চূড়ান্ত ফায়ছালা হবে ক্বিয়ামতের মহাবিচারালয়ে।

আল্লাহ তা'আলা মানব জীবনের কঠিন স্তরগুলি অতিক্রম করার জন্য তাঁর বিধান ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শ অনুযায়ী জীবন যাপনের আদেশ করেছেন। অতএব আল্লাহ তা'আলার আদেশ পালনের ক্ষেত্রে অন্য কোন যুক্তি বা ধারণার অবতারণাই অযৌক্তিক। তাই পুণ্যবানদের জন্য পুনরুত্থান ও ক্বিয়ামত হবে সর্বোত্তম কল্যাণ লাভের প্রবেশ দ্বার। অপরদিকে অপরাধী ও পাপীদের জন্য উক্ত প্রবেশ পথ হবে অকল্যাণের দ্বার।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে পুনরুত্থানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবন করে তার অকল্যাণ হ'তে আত্মরক্ষা করার তওফীক্ব দান করুন-আমীন!

মানুষের সার্বিক জীবনকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে পরিচালনার গভীর প্রেরণাই হ'ল আহলেহাদীছ আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

মানব জাতির প্রকাশ্য শত্রু শয়তান

*মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ**

(২য় কিস্তি)

শয়তানই মানুষকে গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট করে

মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান আল্লাহ্র সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে। তাই সর্বদা সে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপতৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে। সে তার প্রচেষ্টা বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পথ-পন্থা ও কৌশল অবলম্বন করে। অন্মধ্যে নিম্নে কতিপয় উল্লেখ করা হ'ল।-

১. মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করা :

শয়তান ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ও আল্লাহ সম্পর্কে মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِى أَنْفُسِنَا مَا يَتَعَاظَمُ أَحَدُنَا أَنْ يَتَكَلَّمَ بِهِ. قَالَ وَقَدْ وَجَدْتُمُوْهُ، قَالُوا نَعَمْ. قَالَ ذَاكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ-

'ছাহাবাদের একদল লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল যে, আমরা আমাদের অন্তরে কখনো এমন বিষয় অনুভব করি, যা মুখে উচ্চারণ করা আমাদের কাছে খুব কঠিন ঠেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, সত্যিই কি তোমরা এ রকম পেয়ে থাক? তারা বললেন, হ্যাঁ, আমরা এ রকম অনুভব করে থাকি। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, এটি ঈমানের প্রকাশ্য প্রমাণ'।[৩৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন,

يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُوْلُ مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ-

'তোমাদের একজনের কাছে শয়তান এসে বলে, কে এটি সৃষ্টি করেছে? কে ঐটি সৃষ্টি করেছে? এক পর্যায়ে সে বলে, কে তোমার প্রতিপালককে সৃষ্টি করেছে? তোমাদের কারও অবস্থা এ রকম হ'লে সে যেন শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে আল্লাহ্র কাছে আশ্রয় চায় এবং এ রকম চিন্তা-ভাবনা করা হ'তে বিরত থাকে'।[৩৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'শয়তান আদম সন্তানের রক্তনালীতেও চলাচল করতে পারে। আমার আশংকা হ'ল, হয়তো শয়তান চলাচল করে তোমাদের মনে খারাপ ধারণা সৃষ্টি করে দেবে'।[৩৫]

আবার মানুষ যখন ছালাতের জন্য ওযূ করে অথবা ছালাত আদায় করতে আরম্ভ করে তখন শয়তান মানুষের মনে এমন সন্দেহ সৃষ্টি করে যেন তার ওযূ নষ্ট হয়ে গেছে। এ অবস্থায় শব্দ শুনা বা গন্ধ না পাওয়া পর্যন্ত ওযূ করতে হবে না। একদা আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট জনৈক ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হ'ল যে, তার মনে হয়েছিল যেন ছালাতের মধ্যে কিছু বের হয়ে গিয়েছিল। তিনি বললেন, 'সে যেন ফিরে না যায়, যতক্ষণ না শব্দ শুনে বা দুর্গন্ধ পায়'।[৩৬]

এভাবে শয়তান মানুষকে বিভিন্ন বিষয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। মানুষ এভাবে যতই খারাপ চিন্তা করুক না কেন এজন্য তাকে পাকড়াও করা হবে না বা কোন গুনাহ লিখা হবে না যতক্ষণ না সে এগুলি বাস্তবায়ন করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي مَا وَسْوَسَتْ بِهِ صُدُوْرُهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ-

'আমলে পরিণত করা অথবা এটা মুখে উচ্চারণ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা আমার উম্মতের মনের ওয়াসওয়াসাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন'।[৩৭]

২. মানুষকে দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে আকৃষ্ট করা :

দুনিয়া মানুষের জন্য ক্ষণস্থায়ী বাসস্থান হ'লেও শয়তান দুনিয়াকে বিভিন্নভাবে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে দুনিয়ার বিভিন্ন চাকচিক্যের দিকে মানুষদেরকে আকৃষ্ট করার মাধ্যমে পথভ্রষ্ট করে। আদ ও ছামূদ জাতিকে শয়তান চাকচিক্যের মধ্যে ফেলে ধ্বংস করেছে। আল্লাহ বলেন,

* তুলাগাঁও, সুলতানপুর, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

৩৩. মুসলিম, 'ঈমান' অধ্যায়, 'অন্তরের ওয়াসওয়াসা' অনুচ্ছেদ।

৩৪. বুখারী, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, 'ইবলীস ও তার সৈন্যদের আলোচনা' অনুচ্ছেদ হা/৩২৭৬; মুসলিম হা/১৩৪; মিশকাত হা/৬৫।

৩৫. বুখারী হা/২০৩৫ 'ই'তিক্বাদ' অধ্যায়; মুসলিম হা/২১৭৫; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৮৪৯।

৩৬. বুখারী হা/১৭৭ 'ওযূ' অধ্যায়; মুসলিম হা/৩৬১।

৩৭. বুখারী হা/২৫২৮ 'ইতক' অধ্যায়, 'তালাক ও আযাদ করার ক্ষেত্রে ভুল-ত্রুটি' অনুচ্ছেদ; মুসলিম 'ঈমান' অধ্যায়; মিশকাত হা/৬৩।

وَعَاداً وَثَمُوْدَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ-

'আমি আদ ও ছামূদকে ধ্বংস করেছি। তাদের বাড়ী-ঘর থেকেই তাদের অবস্থা তোমাদের জানা হয়ে গেছে। শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল, অতঃপর তাদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল এবং তারা ছিল হুঁশিয়ার' *(আনকাবূত ২৯/৩৮)*।

সাবা জনপদের অধিবাসীদেরকে শয়তান চাকচিক্যে ফেলে শিরক করিয়েছিল। যেমন হুদহুদ পাখি বলেছিল, وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لاَ يَهْتَدُوْنَ-

'আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহ্র পরিবর্তে সূর্যকে সিজদা করছে। শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যাবলী সুশোভিত করে দিয়েছে। অতঃপর তাদেরকে সৎপথ থেকে নিবৃত্ত করেছে। অতএব তারা সৎপথ পায় না' *(নামল ২৭/২৪)*।

বদর যুদ্ধের দিন ইবলীস মানুষ রূপে কাফেরদের কাছে এসে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِّنْكُمْ إِنِّيْ أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيْ أَخَافُ اللهَ وَاللهُ شَدِيْدُ الْعِقَابِ-

'আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বলল যে, আজকের দিনে কোন মানুষই তোমাদের উপর বিজয়ী হ'তে পারবে না। আর আমি হ'লাম তোমাদের সমর্থক। অতঃপর যখন সামনাসামনি হ'ল উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুতপায়ে পেছনে পালিয়ে গেল এবং বলল, আমি তোমাদের সাথে নেই। আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহ্র আযাব অত্যন্ত কঠিন' *(আনফাল ৮/৪৮)*।

সকল যুগে সকল মানুষকে শয়তান দুনিয়ার সৌন্দর্য ও চাকচিক্যেরের প্রতি আকৃষ্ট করে এবং বিভিন্ন পাপে লিপ্ত করে। আল্লাহ বলেন, تَاللهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ- 'আল্লাহ্র কসম! আমি আপনার পূর্বে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নিকট রাসূল প্রেরণ করেছি, অতঃপর শয়তান তাদের কর্মসমূহ শোভনীয় করে দেখিয়েছে। আজ সে-ই তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি' *(নাহল ১৬/৬৩)*।

আর শয়তান আল্লাহ্র কাছেই মানুষকে দুনিয়ার চাকচিক্যে ফেলে গোমরাহ করার ওয়াদা করে এসেছিল।

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِيْ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ، إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ-

'সে বলল, হে আমার পালনকর্তা! আপনি যেমন আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, আমিও তাদের সবাইকে পৃথিবীতে নানা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট করব এবং তাদের সবাইকে পথভ্রষ্ট করব। আপনার একনিষ্ঠ বান্দাদের ব্যতীত' *(হিজর ১৫/৩৯-৪০)*।

৩. শিরকের প্রচলন করা :

পৃথিবীতে প্রথম শিরকের প্রচলন হয়েছিল নূহ (আঃ)-এর কওমের মধ্যে। এটা হয়েছিল শয়তানের প্ররোচনা ও বুযর্গ লোকদের প্রতি অতি মাত্রায় ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে। নূহ (আঃ)-এর কওমের বুযর্গ লোকদের মৃত্যুর পর শয়তান ঐ কওমের লোকদের প্ররোচিত করল তারা যেন ঐ সব বুযর্গগণ যেসব আসরে বসতেন সেখানে তাদের প্রতিমা বানিয়ে রাখে এবং তাদের নামে এগুলোর নামকরণ করে। তারা তাই করল। তবে সে সময় এগুলোর উপাসনা করা হ'ত না। এসব লোক মৃত্যুবরণ করার পর ক্রমান্বয়ে তাওহীদের জ্ঞান বিস্মৃত হ'ল, তখন এগুলোর উপাসনা ও পূজা হ'তে লাগল।[৩৮]

ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, তখনকার যুগে নূহ (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের প্রতি শয়তান এ কুমন্ত্রণা দেয় যে, এরা যে স্থানে বসতেন তোমরা সে সব স্থানে কিছু মূর্তি নির্মাণ করে তাদের নামে সে সবের নামকরণ করে দাও। তখন তারা তাই করে। তখনও কিন্তু এগুলির পূজা শুরু হয়নি। তারপর তাদের মৃত্যু হয় এবং ইলম লোপ পায়। অতঃপর সেসবের পূজা শুরু হয়। কোন কোন মুফাসসিরের মতে, আদম ও নূহ (আঃ)-এর মধ্যবর্তী কালে কয়েকজন পুণ্যবান লোক ছিল তাদের বেশ কিছু অনুসারীও ছিল। তারপর যখন তাদের মৃত্যু হয় তখন তাদের অনুসারীরা বলল, আমরা যদি তাদের প্রতিকৃতি তৈরী করে রাখি তাহ'লে তাদের কথা স্মরণ করে ইবাদতে আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। যখন তাদের মৃত্যু হয় এবং অন্য প্রজন্ম আসে তখন শয়তান তাদের প্রতি এ বলে প্ররোচনা দেয় যে, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের উপাসনা করত এবং তাদের

৩৮. *বুখারী হা/৪৯২০।*

অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করত। তখন তারা তাদের পূজা শুরু করে দেয়।[৩৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ বলেন,

وَإِنِّى خَلَقْتُ عِبَادِى حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِيْنُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِيْنِهِمْ-

'আমি আমার বান্দাদেরকে 'হানীফ' অর্থাৎ আল্লাহ্র প্রতি একনিষ্ঠ রূপে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর শয়তান তার পিছে লেগে তাকে আল্লাহ্র পথ থেকে দূরে নিয়ে যায়'।[৪০]

৪. বিদ'আত চালু করা :

বিদ'আত সুন্নাতের বিপরীত আমল এবং ইবাদতের নামে ইসলামের মধ্যে নতুন সংযোজন। বিদ'আতকারীর কোন আমল আল্লাহ্র নিকট কবুল হবে না[৪১] এবং আখেরাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শাফা'আত ও কাওছারের পানি থেকে বঞ্চিত হবে।[৪২] তাই একজন বিদ'আতীর জাহান্নামে যাওয়ার সম্ভাবনা সাধারণ গোনাহগারের চেয়ে বেশী। তাই শয়তান সমাজে বিদ'আত চালু করতে চায়। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, اَلْبِدْعَةُ أَحَبُّ إِلَى إِبْلِيْسَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ، اَلْمَعْصِيَةُ يُتَابُ مِنْهَا، وَالْبِدْعَةُ لاَ يُتَابُ مِنْهَا- 'ইবলীসের কাছে গোনাহ ও পাপাচারের চেয়ে বিদ'আত বেশী প্রিয়। কারণ গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তির তওবা করার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু বিদ'আতে লিপ্ত ব্যক্তির তওবা করার সম্ভাবনা থাকে না'।[৪৩]

৫. রাগান্বিত করা :

রাগ মানুষের একটি খারাপ গুণ। রাগের কারণে মানুষ যে কোন অন্যায় করতে পারে। আর রাগ আসে শয়তানের পক্ষ থেকে। সুলায়মান ইবনু ছুরাদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন দু'জন লোক গালাগালি করছিল। তাদের একজনের চেহারা লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার রগগুলো ফুলে গিয়েছিল। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি এমন একটি দো'আ জানি, যদি এই লোকটি তা পড়ে তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে। সে যদি পড়ে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানি' তবে তার রাগ চলে যাবে। তখন লোকেরা তাকে বলল, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তুমি আল্লাহ্র নিকট শয়তান থেকে আশ্রয় চাও। সে বলল, আমি কি পাগল হয়েছি'।[৪৪]

৬. অলসতা :

ইংরেজীতে একটি কথা আছে, An idle brain is the devil's workshop. 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা'। শয়তান মানুষকে গুমরাহ করার জন্য কর্মবিমুখ ও অলস করে তোলে। বিশেষ করে দ্বীনের কাজের ক্ষেত্রে অলস করে তোলে এবং দুনিয়াবী ও খারাপ কাজে উৎসাহিত করে। মানুষ ঘুমালে ফজর ছালাত কাযা করার জন্য চেষ্টা করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমায় শয়তান তার মাথার পিছন দিকে তিনটি গিরা দেয় এবং প্রত্যেক গিরার উপর মোহর মেরে বা থাবা মেরে বলে, রাত অনেক আছে তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমাও। যদি সে জাগে ও দো'আ পড়ে তাহ'লে একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ওযূ করে তাহ'লে আরও একটি গিরা খুলে যায়। তারপর যদি সে ছালাত আদায় করে তবে অপর গিরাটিও খুলে যায় এবং সে সকালে প্রফুল্ল মন ও পবিত্র অন্তরে সকাল করে। অন্যথা সে সকালে উঠে কলুষিত অন্তর ও অলস মনে'।[৪৫]

৭. পরস্পর তর্কের মাধ্যমে ঝগড়া লাগানো ও আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে জানে না :

শয়তান মানুষের মাঝে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে এবং আস্তে আস্তে তর্ক ঝগড়ায় রূপ নেয়। আল্লাহ বলেন,

وَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ لَيُوْحُوْنَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوْكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُوْنَ-

'নিশ্চয়ই শয়তানরা তাদের বন্ধুদেরকে প্রত্যাদেশ করে, যেন তারা তোমাদের সাথে তর্ক করে। যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তোমরাও মুশরিক হয়ে যাবে' *(আন'আম ৬/১২১)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ فِي اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيْدٍ- 'কতক মানুষ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করেন' *(হজ্জ ২২/৩)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ. 'নিশ্চয়ই সে তোমাদেরকে মন্দ ও অশ্লীল কাজের আদেশ দেয় এবং

৩৯. *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৬-১৪৭।*
৪০. *মুসলিম হা/২৮৬৫ 'জান্নাতের বিবরণ' অধ্যায়; আহমাদ হা/১৬৮৩৭।*
৪১. *মুসলিম হা/১৭১৮; রিয়াযুছ ছালেহীন হা/১৬৪৬, ১৬৯।*
৪২. *মুসলিম হা/৪২৪৩।*
৪৩. *শাত্বেবী, আল-ই'তিছাম ১/১১৯; সুয়ূতী, আল-আমরু বিল ইত্তিবা, পৃঃ ১৯।*
৪৪. *বুখারী হা/৩২৮২ 'সৃষ্টি সূচনা' অধ্যায়; মুসলিম হা/২৬১০।*
৪৫. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২১৯; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১১৫১।*

আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলে যা তোমরা জান না' *(বাক্বারাহ ২/১৬৯)*।

৮. পাপকাজের চাকচিক্য দেখিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে অবস্থান করানো :

বদর যুদ্ধের দিন কাফেরদের সাথে গায়িকা মেয়েরা ছিল এবং তারা গানবাজনাও করছিল। শয়তান তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। সে তাদেরকে মিষ্টি কথা দিয়ে ভুলাচ্ছিল এবং তাদের কার্যাবলী তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল। তাদের কানে কানে সে বলছিল, 'তোমাদেরকে কে পরাজিত করতে পারে? আমি তোমাদের সাহায্যকারী হিসাবে রয়েছি'। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَـوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ-

'যখন শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে খুব চাকচিক্যময় ও শোভনীয় করে দেখাচ্ছিল, তখন সে গর্বভরে বলেছিল, কোন মানুষই আজ তোমাদের উপর বিজয় লাভ করতে পারবে না, আমি সাহায্যার্থে তোমাদের নিকটেই থাকব' *(আনফাল ৮/৪৮)*।

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে অতিরঞ্জিত কথা চালু করা :

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মুহাব্বত করতে হবে সেভাবে যেভাবে তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। শয়তান মাঝে মাঝে এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সম্পর্কে এমন কথা চালু করে, যা তিনি বলতে নিষেধ করেছেন। যেমন কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে লক্ষ্য করে বলল, হে আমাদের রাসূল, হে আমাদের সর্বোত্তম ব্যক্তি ও সর্বোত্তমের সন্তান, আমাদের প্রভু, আমাদের প্রভু তনয়! তখন তিনি বললেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِتَقْوَاكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُوْلُهُ وَاللَّهِ مَا أُحِـبُّ أَنْ تَرْفَعُوْنِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ-

'হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি মুহাম্মাদ আল্লাহ্র বান্দা ও তাঁর রাসূল। আল্লাহ আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর ঊর্ধ্বে আমাকে স্থান দাও এটা আমি পসন্দ করি না'।[৪৬]

অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কতিপয় ছাহাবী তাঁকে বলল, আপনি আমাদের প্রভু। তদুত্তরে তিনি বললেন, 'বরকতময় মহান আল্লাহই হ'লেন একমাত্র প্রভু'। আর তারা যখন বললেন, আপনি আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে সর্বোত্তম এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল। তখন তিনি বললেন, 'তোমরা যা বলছিলে বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের উপর সওয়ার না হ'তে পারে'।[৪৭]

১০. গণক বা যাদুর মাধ্যমে বিভ্রান্ত করা :

একদল শয়তান আকাশ থেকে ফেরেশতাদের কথা শুনার জন্য তাঁদের নির্ধারিত স্থানে গমন করে এবং চুরি করে কিছু শুনেও ফেলে। তাদের মধ্যে যারা উপরে থাকে তারা তাদের নীচে অবস্থানকারীদেরকে তা বলে দেয়। এভাবে ঐ কথাগুলো দুনিয়ায় চলে আসে এবং গণক যাদুকরদের কানে পৌঁছে যায়। আর গণক ও যাদুকররা সেই একটি সত্য কথার সাথে আরো দশটি মিথ্যা কথা বলে প্রচার করে। আর যখন একটি কথা সত্যে পরিণত হয় তখন তাদের কদর বেড়ে যায় ও মানুষ সেদিকে আকৃষ্ট হয়। ঐ শয়তান জিনদের জ্বালিয়ে দেয়ার জন্য জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। কিন্তু তার পূর্বেই কিছু কিছু খবর তারা দুনিয়ায় পৌঁছে দেয়। কখনো কখনো আবার খবর পৌঁছানোর আগেই তারা জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي الـسَّمَاءِ بُرُوجـاً وَّزَيَّنَّاهَـا لِلنَّـاظِرِيْنَ- وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيْمٍ- إِلاَّ مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِيْنٌ-

'আমি আকাশে রাশিচক্র বানিয়েছি এবং ওকে দর্শকদের চোখে সৌন্দর্যময় জিনিস করেছি। প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান হ'তে ওকে রক্ষিত রেখেছি। যে কেউ কোন কথা চুরি করে শুনবার চেষ্টা করে তার পশ্চাদ্ধাবন করে এক তীক্ষ্ণ অগ্নিশিখা' *(হিজর ১৫/১৬-১৮)*।

[চলবে]

৪৬. *আহমাদ হা/১২৫৭৪; সিলসিলাহ ছহীহাহ হা১৫৭২।*

৪৭. *আবূদাঊদ হা/৪৮০৬ 'আদব' অধ্যায়; মিশকাত হা/৪৯০১, হাদীছ ছহীহ।*

ইসলামে শ্রমিকের অধিকার : প্রেক্ষিত মে দিবস

*শেখ আব্দুছ ছামাদ**

বছর ঘুরে আবার এসেছে মে মাস। শ্রমিকের অধিকার আদায় আন্দোলনের স্মৃতিবিজড়িত এ মাসের ১ তারিখ সারা বিশ্বে পালিত হয় 'বিশ্ব শ্রমিক দিবস' (International Workers Day) হিসাবে। এ দিবসটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার এবং মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক, দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা।

মে দিবসের ইতিহাস :

১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকার মেহনতী শ্রমিকশ্রেণী দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীসহ আরো কয়েকটি ন্যায্য দাবী ও অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে জীবন বিসর্জন দিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব শ্রমিক আন্দোলনের সূচনা করেছিল। ১লা মে'র ঐ ধর্মঘট দিবসের আগে যুক্তরাষ্ট্র বা বিশ্বের কোথাও শ্রম আইন ছিল না। শ্রমিকদের মানবিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বলতেও কিছু ছিল না। তারা ছিল মালিকদের দাস মাত্র। তাদের কাজের কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা ছিল না। ছিল না সাপ্তাহিক কোন ছুটি। ছিল না চাকুরীর স্থায়িত্ব ও ন্যায়সঙ্গত মজুরীর নিশ্চয়তা। মালিকরা তাদের ইচ্ছামত শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিত। এমনকি দৈনিক ১৮-২০ ঘণ্টা পর্যন্ত কাজ করতেও বাধ্য করত শ্রমিকদের। এ অন্যায়, বঞ্চনা ও যুলুমের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রমিকরা পর্যায়ক্রমে তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এ আন্দোলনের অংশ হিসাবে 'আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার'-এর ১৮৮৫ সালের সম্মেলনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে দৈনিক ৮ ঘণ্টা কাজের দাবীতে ১৮৮৬ সালের ১লা মে আমেরিকা ও কানাডার প্রায় তিন লক্ষাধিক শ্রমিক শিকাগোর 'হে মার্কেটে' ঢালাই শ্রমিক, তরুণ নেতা এইচ সিলভিসের নেতৃত্বে এক বিক্ষোভ সমাবেশের মাধ্যমে সর্বপ্রথম সর্বাত্মক শ্রমিক ধর্মঘট পালন করে। শ্রমিকদের সমাবেশ চলাকালে মালিকদের স্বার্থ রক্ষাকারী পুলিশ ও কতিপয় ভাড়াটিয়া গুণ্ডা সম্পূর্ণ বিনা উস্কানিতে অতর্কিতভাবে গুলী চালিয়ে ৬ জন শ্রমিককে নৃশংসভাবে হত্যা ও শতাধিক শ্রমিককে আহত করে। কিন্তু এতেও শ্রমিকরা দমে যায়নি। শ্রমিকদের ইস্পাতকঠিন ঐ সফল ধর্মঘটের কারণে কোন কোন মালিক ৮ ঘণ্টা কর্ম সময়ের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়। ফলে শ্রমিকরা আরো উৎসাহী ও আত্মপ্রত্যয়ী হয়ে ওঠে এবং সর্বস্তরে ৮ ঘণ্টা কর্ম সময়ের দাবী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ২রা মে রবিবারের সাপ্তাহিক বন্ধের দিনের পর ৩ তারিখেও ধর্মঘট অব্যাহত রাখে।

ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে আয়োজিত ৪ঠা মে শিকাগো শহরের 'হে' মার্কেটের বিশাল শ্রমিক সমাবেশে আবারো মালিকগোষ্ঠীর গুণ্ডা ও পুলিশ বাহিনী বেপরোয়াভাবে গুলী বর্ষণ করে। এতে ৪ জন শ্রমিক নিহত ও বিপুল সংখ্যক আহত হয়। রক্তে রঞ্জিত হয় 'হে' মার্কেট চত্বর। গ্রেফতার করা হয় শ্রমিক নেতা স্পাইজ ও ফিলডেনকে। ঘটনার এখানেই শেষ নয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে রীতিমত 'চিরুনী অভিযান' চালিয়ে শিকাগো শহর ও এর আশপাশের এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী ফিশার, লুইস, জর্জ এঞ্জেল, মাইকেল স্কোয়ার ও নীবেসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ শ্রমিক নেতাকে।

পরবর্তীতে শ্রমিকদের এই ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনের বিরোধিতাকারী মালিকপক্ষের ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'জুরি' গঠন করে ১৮৮৬ সালের ২১ জুন শুরু করা হয় বিচারের নামে প্রহসন। একতরফা বিচারের মাধ্যমে ১৮৮৬ সালের ৯ অক্টোবর ঘোষিত হয় বিচারের রায়। রায়ে বিশ্বজনমতকে উপেক্ষা করে শ্রমিক নেতা পার্সন্স, ফিলডেন, স্পাইজ, লুইস, স্কোয়ার, এঞ্জেল ও ফিশারের বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ প্রদান করা হয় এবং ১৮৮৭ সালের ১১ নভেম্বর সে আদেশ কার্যকর করা হয়। শ্রমিক নেতা ও কর্মী হত্যার এ দিবসটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে প্রতিবছর ১লা মে 'শ্রমিক হত্যা দিবস' ও 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস' হিসাবে পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। দৈনিক ৮ ঘণ্টা কার্য সময় ও সপ্তাহে এক দিন সাধারণ ছুটি প্রদানের ব্যবস্থা করে প্রথম শ্রম আইন প্রণীত হয়। অন্যদিকে নারকীয় এ হত্যাযজ্ঞ গোটা বিশ্বের শ্রমিকদের অধিকারে এনে দেয় নতুন গতি। শিকাগো শহরে সৃষ্ট এ আন্দোলন ক্রমশ দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বময়। পৃথিবীর সকল শ্রমজীবী মানুষ এ আন্দোলনের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে দেয় 'দুনিয়ার মজদুর এক হও' শ্লোগানটি। সেই সাথে ১২৫ বছর আগে ঘটে যাওয়া সে ঘটনাটির কথা এখন প্রতিবছর বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্মরণ করা হয়ে থাকে 'বিশ্ব শ্রমিক দিবস' বা 'মে দিবস' হিসাবে।

ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকার :

শান্তি ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার ধর্ম ইসলামে শ্রমিকের মর্যাদা ও অধিকারের কথা বিধৃত হয়েছে। শ্রমিকদের প্রতি সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছে ইসলাম। ইসলাম শ্রমের প্রতি যেমন মানুষকে উৎসাহিত করেছে *(জুম'আহ ১০)*, তেমনি শ্রমিকের সম্মান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার পূর্ণ প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) শ্রমিক ও শ্রমজীবী মানুষকে অত্যন্ত সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ যারা মানুষের সুখের জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে নিজেদেরকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়, তারাতো মহান আল্লাহ্‌র কাছেও মর্যাদার অধিকারী।

* *বুলারাটি, আলীপুর, সাতক্ষীরা।*

শ্রমের মর্যাদা বুঝাতে গিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ- 'কারো জন্য স্বহস্তের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার্য আর নেই। আর আল্লাহ্র নবী দাঊদ (আঃ) স্বহস্তে জীবিকা নির্বাহ করতেন'।[৪৮]

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলাম বদ্ধপরিকর। আর একজন শ্রমিকের সবচেয়ে বড় অধিকার বা দাবী হ'ল, তার শ্রমের যথোপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করা। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ- 'তোমরা শ্রমিককে তার শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পারিশ্রমিক দিয়ে দাও'।[৪৯]

ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক :

ইসলামে মালিক-শ্রমিক সম্পর্ক হবে পিতা-সন্তানের ন্যায়। নিজের পরম আত্মীয়ের মতোই শ্রমিকের সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ আচরণ করা, পরিবারের সদস্যদের মতই তাদের আপ্যায়ন করা, শ্রমিকের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার প্রতিটি মুহূর্তের প্রতি মালিকের খেয়াল রাখা এবং তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করা মালিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। শ্রমিককে তার প্রাপ্য পূর্ণভাবে যথাসময়ে প্রদান করাও মালিকের একটি প্রধান দায়িত্ব। অনেক সময় শ্রমিকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মালিকগণ উপযুক্ত মজুরী না দিয়ে যৎ সামান্য মজুরী দিয়ে শ্রমিকদের অধিকার বঞ্চিত করে। এ ধরনের মালিকদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মহান আল্লাহ বলেন, ক্বিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হবে। তাদের মধ্যে একজন হ'ল- وَ رَجُلٌ أَسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِه أَجْرَهُ- 'যে শ্রমিকের নিকট থেকে পূর্ণ শ্রম গ্রহণ করে অথচ তার পূর্ণ মজুরী প্রদান করে না'।[৫০]

অপরদিকে একজন শ্রমিকের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হ'ল- চুক্তি মোতাবেক মালিকের প্রদত্ত কাজ অত্যন্ত নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে সম্পাদন করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ مِنَ الْعَامِلِ إِذَا عَمِلَ أَنْ يُّحْسِنَ- 'আল্লাহ ঐ শ্রমিককে ভালবাসেন যে সুন্দরভাবে কার্য সমাধা করে'।[৫১] কিন্তু কোন কোন শ্রমিক মালিকের কাজে ফাঁকি দিয়ে নিয়মিত হাযিরা খাতায় স্বাক্ষর করে বেতন উত্তোলন করে থাকে, যা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এজন্য তাকে ক্বিয়ামতের মাঠে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হ'তে হবে। আর যদি শ্রমিক তার উপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুরূপে পালন করে, তাহ'লে তার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দ্বিগুণ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে বলেন, 'তিন শ্রেণীর লোকের দ্বিগুণ ছওয়াব প্রদান করা হবে। তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল- وَالْعَبْدُ الْمَمْلُوْكُ إِذَا أَدَّى حَقَّ اللهِ وَ حَقَّ مَوَالِيْهِ 'ঐ শ্রমিক যে নিজের মালিকের হক্ব আদায় করে এবং আল্লাহ্র হক্বও আদায় করে'।[৫২] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, لِلْعَبْدِ الْمَمْلُوْكِ الصَّالِحِ أَجْرَانِ- 'সৎ শ্রমিকের জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে'। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, وَالَّذِىْ نَفْسُ أَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلاَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَجُّ وَبِرُّ أُمِّىْ لَأَحْبَبْتُ أَنْ أَمُوْتَ وَأَنَا مَمْلُوْكٌ- 'যেই সত্তার হাতে আবূ হুরায়রার প্রাণ তার কসম! যদি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ, হজ্জ ও আমার মায়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের ব্যাপারগুলো না থাকত, তাহ'লে আমি শ্রমিক হিসাবে মৃত্যুবরণ করতে পসন্দ করতাম'।[৫৩]

শ্রমিকদের যে বিষয়টি মনে রাখা যরূরী তা হ'ল- বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে। সুতরাং মে দিবসে যেকোন ব্যক্তির যানবাহন চালানোর বা শিল্প প্রতিষ্ঠান ও দোকানপাট খোলা রাখারও অধিকার আছে। তাতে বাধাদানের অধিকার কারো নেই। কিন্তু আমাদের দেশে মে দিবসে যদি কেউ যানবাহন চালায় বা দোকানপাট খোলা রাখে তাহ'লে উচ্ছৃংখল কিছু শ্রমিককে গাড়ি ভাংচুর করতে এবং দোকানপাট জোর করে বন্ধ করে দিতে দেখা যায়। যা আদৌ সমর্থনযোগ্য নয়। অনুরূপভাবে হরতাল-ধর্মঘটও বর্জন করা আবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, এ সুন্দর পৃথিবীর রূপ-লাবণ্যতায় শ্রমিকদের কৃতিত্বই অগ্রগণ্য। কিন্তু শত আক্ষেপ! সভ্যতার কারিগর এ শ্রেণীটি সর্বদাই উপেক্ষিত, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত। উদয়াস্ত উষ্ণ ঘামের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ নিয়ে খেটে যে শ্রমিক তার মালিকের অর্থযন্ত্রটি সচল রাখে, সেই মালিকেরই অবিচারে শ্রমিকদের অচল জীবনটি আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। এটাকে সেই মৌমাছির সাথে তুলনা করা যায়, যারা দীর্ঘ পরিশ্রমের মাধ্যমে মধু সংগ্রহ করে চাকে সঞ্চয় করে, কিন্তু তার ভাগ্যে একফোঁটা মধুও জোটে না। সুতরাং সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় মালিক-শ্রমিকের বৈরিতাপূর্ণ সম্পর্কের অবসান ঘটিয়ে ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও শ্রমনীতি বাস্তবায়ন করে তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। আর এজন্য সর্বাগ্রে উচিত ইসলাম প্রদর্শিত মালিক-শ্রমিক নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

৪৮. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯।*
৪৯. *ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৯৮৭, 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*
৫০. *বুখারী, মিশকাত হা/২৯৮৪।*
৫১. *ছহীহুল জামে' হা/১৮৯১, হাদীছ হাসান।*
৫২. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/১১, 'ঈমান' অধ্যায়।*
৫৩. *বুখারী হা/২৫৮৪; মুসলিম হা/৪৪১০।*

অর্থনীতির পাতা
ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা

*ড. মুহাম্মাদ আজিবার রহমান**

জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজনে মানুষকে উপার্জনের নানাবিধ পথ বেছে নিতে হয়। ইসলামের দিকনির্দেশনা হ'ল হালাল পথে জীবিকা উপার্জন করা। হারাম পথে উপার্জিত অর্থ-সম্পদ ভোগ করে ইবাদত-বন্দেগী করলে তা আল্লাহ্র নিকট গৃহীত হবে না। কারণ ইবাদত কবুলের আবশ্যিক পূর্বশর্ত হ'ল হালাল উপার্জন।[৫৪] ক্বিয়ামতের ময়দানে বনু আদমকে পাঁচটি প্রশ্ন করা হবে এবং এর যথাযথ উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত কোন মানুষ সামান্য পরিমাণ সামনে অগ্রসর হ'তে পারবে না। তান্মধ্যে একটি হ'ল 'সে কোন পথে অর্থ উপার্জন করেছে'।[৫৫] বুঝা গেল, অর্থ-সম্পদ হালাল পথে উপার্জন করতে হবে, অন্যথা ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দিনে মুক্তির কোন পথ খোলা থাকবে না। আর হালাল পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জনের একটি অন্যতম মাধ্যম হ'ল সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, أَطْيَبُ الْكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ 'নিজ হাতে কাজ করা এবং হালাল পথে ব্যবসা করে যে উপার্জন করা হয় তা-ই সর্বোত্তম'।[৫৬]

ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের গুরুত্ব ইসলামে অনস্বীকার্য। সততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার সাথে বৈধ পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতে ইসলাম বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ- 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ' *(নিসা ২৯)*। আল্লাহ আরো বলেন, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللهِ- 'যখন ছালাত শেষ হয়ে যাবে তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহ (জীবিকা) তালাশ কর' *(জুম'আ ১০)*। সুতরাং জীবিকা উপার্জনের উত্তম পেশা হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উল্লিখিত আয়াতে ছালাতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের পরই ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে।

সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করলে পরকালীন জীবন কল্যাণময় হবে মর্মে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الْأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ والصِّدِّيْقِيْنَ وَ الشُّهَدَاءِ، 'সত্যবাদী আমানতদার ব্যবসায়ী ক্বিয়ামতের দিন নবী, ছিদ্দীক্ব এবং শহীদগণের সাথে থাকবে'।[৫৭]

ব্যবসা-বাণিজ্য জীবিকা উপার্জনের সর্বোত্তম পেশা হওয়ায় মহানবী (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীনসহ অধিকাংশ ছাহাবী এর মাধ্যমেই জীবিকা নির্বাহ করতেন। কুরআনের বাণী এবং মহানবী (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ছাহাবীগণ জীবন-জীবিকার সন্ধানে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েন। এমনকি ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ঐ সকল ব্যবসায়ী ছাহাবীর মাধ্যমেই অবিমিশ্র-নির্ভেজাল ইসলামের আগমন ঘটে। মুসলমানদের ঐতিহ্যবাহী পেশা ব্যবসা-বাণিজ্য। সুতরাং ব্যবসা-বাণিজ্যে সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা, আমানতদারী ইত্যাদির উপস্থিতি অতীব যরূরী।

সততার সাথে হালাল উপার্জনের মাধ্যম হিসাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি উৎসাহিত করে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، 'আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল এবং সূদকে হারাম করেছেন' *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, ইসলাম উপার্জনের পেশা হিসাবে হালাল পথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেমন উৎসাহ দিয়েছে, তেমনি অবৈধ পথে অর্থ-সম্পদ উপার্জন করতেও নিষেধ করেছে। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে সাময়িকভাবে লাভবান হওয়া গেলেও এর শেষ পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কাজেই অন্যায়, যুলুম, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা, মুনাফাখোরী, কালোবাজারী, মওজুদদারী ইত্যাদি

* *সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটি, বারিধারা ক্যাম্পাস, ঢাকা।*

৫৪. মুসলিম; মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।
৫৫. তিরমিযী, হা/২৪১৬, হাদীছ ছহীহ।
৫৬. আহমাদ, মিশকাত হা/২৭৮৩; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৬০৭।
৫৭. তিরমিযী, হা/১২০৯; হাদীছ ছহীহ, ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৭৮২।

অবৈধ ও ইসলাম বিরোধী কার্যাবলী পরিহার করে সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে। রাসূলুলাহ (ছাঃ) বললেন, إِنَّ التُّجَّارَ يُبْعَثُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلاَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ وَبَرَّ وَصَدَقَ 'ক্বিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীরা মহা অপরাধী হিসাবে উত্থিত হবে। তবে যারা আল্লাহকে ভয় করবে, নেকভাবে সততা ও ন্যায়নিষ্ঠার সাথে ব্যবসা করবে তারা ব্যতীত'।[৫৮] ক্বিয়ামতের ময়দানে কঠিন শাস্তি হ'তে মুক্তি পেতে হ'লে আল্লাহভীতি সহকারে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে। কাউকে সামান্যতম ঠকানোর মানসিকতা অন্তরে পোষণ করা যাবে না। তাছাড়া মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি মওজুদ করে রেখে পণ্যমূল্য বাড়িয়ে মুনাফা লাভের প্রবণতা থেকেও বেঁচে থাকতে হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ– 'যে মওজুদদারী করে সে পাপী'।[৫৯]

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করলে ব্যবসায়ী এবং ক্রেতা উভয়ই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ব্যবসায়ীদেরকে মিথ্যা পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছেন। বিশিষ্ট ছাহাবী ওয়াসিলা ইবনুল আকওয়া (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে আসতেন এবং বলতেন, يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ– 'হে বণিক দল! তোমরা মিথ্যা কথা ও মিথ্যা কারবার থেকে অবশ্যই দূরে থাকবে'।[৬০]

পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সকল ব্যবসায়ীকে মিথ্যা কসম বর্জন করতে হবে। কারণ তা ইসলামে নিষিদ্ধ। আবু কাতাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِى الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ– 'ব্যবসার মধ্যে অধিক কসম খাওয়া হ'তে বিরত থেকো। এর দ্বারা মাল বেশী বিক্রি হয়, কিন্তু বরকত বিনষ্ট হয়ে যায়'।[৬১] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'অধিক কসম খাওয়ার প্রবণতা ব্যবসায়ের কাটতি বাড়ায়, কিন্তু বরকত দূর করে দেয়'।[৬২] মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ীদের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে অন্য আরেকটি হাদীছে সাবধান বাণী উচ্চারিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ– 'তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না ও তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদেরকে পবিত্রও করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। আবূ যার বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কারা নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্ত? তিনি বললেন, টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী, উপকার করে খোটা প্রদানকারী এবং ঐ ব্যবসায়ী যে মিথ্যা শপথ করে তার পণ্য বিক্রি করে'।[৬৩] মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ী এতই ঘৃণিত যে, ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না। প্রখ্যাত ছাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক বেদুঈন একটি ছাগী নিয়ে যাচ্ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি কি ছাগীটি তিন দিরহামে বিক্রি করবে? লোকটি বলল, আল্লাহ্র কসম! বিক্রি করব না। কিন্তু সে পরে সেই মূল্যেই ছাগীটি বিক্রি করে দিল। আমি এ বিষয়টি রাসূলুল্লাহ্র (ছাঃ)-এর কাছে এসে উল্লেখ করলাম। তিনি আমার কথাগুলো শুনে বললেন, بَاعَ آخِرَتَهُ بِدُنْيَاهُ 'লোকটি দুনিয়ার বিনিময়ে তার পরকালকে বিক্রি করে দিয়েছে'।[৬৪]

ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় একটি জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ধোঁকা ও প্রতারণা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। দ্রব্যের কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে ক্রেতার সম্মুখে তা প্রকাশ করতে হবে। সেক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই লাভবান হবে এবং তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। কোন প্রকার গোপনীয়তার আশ্রয় গ্রহণ করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পণ্যে ভেজাল দিয়ে প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا

৫৮. *তিরমিযী, হা/১২১০; ইবনু মাজাহ হা/২১৪৬; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৪৫৮।*
৫৯. *মুসলিম হা/৪২০৬।*
৬০. *ছহীহ আত-তারগীব ওয়াত তারহীব, হা/১৭৯৩।*
৬১. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৬০৭, ২৭৯৩।*
৬২. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৯৪।*
৬৩. *মুসলিম, হা/১০৫; মিশকাত হা/২৭৯৫।*
৬৪. *সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩৬৪।*

صَاحِبَ الطَّعَامِ، قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّيْ- 'একদা নবী করীম (ছাঃ) কোন এক খাদ্যস্তূপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি খাদ্যস্তূপে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে দেখলেন তার হাত ভিজে গেছে। তিনি বললেন, হে খাদ্যের মালিক! ব্যাপার কি? উত্তরে খাদ্যের মালিক বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! বৃষ্টিতে উহা ভিজে গেছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, 'তাহ'লে ভেজা অংশটা শস্যের উপরে রাখলে না কেন? যাতে ক্রেতারা তা দেখে ক্রয় করতে পারে। নিশ্চয়ই যে প্রতারণা করে সে আমার উম্মত নয়'।[৬৫] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا- 'ক্রেতা বিক্রেতা যতক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে না যায়, ততক্ষণ তাদের চুক্তি ভঙ্গ করার ঐচ্ছিকতা থাকবে। যদি তারা উভয়েই সততা অবলম্বন করে ও পণ্যের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে, তাহ'লে তাদের পারস্পরিক এ ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি তারা মিথ্যার আশ্রয় নেয় এবং পণ্যের দোষ গোপন করে তাহ'লে তাদের এ ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত শেষ হয়ে যাবে'।[৬৬]

প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে দ্রব্যের মূল্য বাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ক্রয়ের ইচ্ছা না থাকলে কেবলমাত্র আসল ক্রেতাকে প্রতারিত করার উদ্দেশ্যে পণ্যের মূল্য ঊর্ধ্বমুখী করে দেওয়া ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لاَ تَنَاجَشُوْا 'তোমরা ক্রেতাকে ধোঁকা দেওয়ার লক্ষ্যে ক্রেতার মূল্যের উপর মূল্য বৃদ্ধি করে ক্রেতাকে ধোঁকা দিয়ো না'।[৬৭] কারণ তা ধোঁকাবাজির অন্তর্ভুক্ত, যা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি যত সামান্যই হোক ক্রয়-বিক্রয়ের সময় তা বর্জন করা উচিত। ব্যবসা-বাণিজ্যের ন্যায় একটি মহৎ পেশায় নিয়োজিত লোকদের বৈশিষ্ট্য তেমন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ ব্যাপারে হাসান বিন ছালিহর ক্রীতদাসী বিক্রয়ের ঘটনাটি একটি অনন্য উদাহরণ। হাসান বিন ছালিহ একটি ক্রীতদাসী বিক্রয় করলেন। ক্রেতাকে বললেন, মেয়েটি একবার থুথুর সাথে রক্ত ফেলেছিল। তা ছিল মাত্র একবারের ঘটনা। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার ঈমানী হৃদয় তা উল্লেখ না করে চুপ থাকতে পারল না, যদিও তাতে মূল্য কম হওয়ার আশংকা ছিল।[৬৮] সুতরাং ক্রেতা বিক্রেতা উভয়কে ধোঁকাবাজি ও প্রতারণার আশ্রয় নেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। তাহ'লে ইহ-পরকালে কল্যাণ ও মুক্তিলাভ সম্ভব হবে।

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ওযন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নেওয়ার সময় বেশী নেওয়া এবং দেওয়ার সময় কম দেওয়া ইসলামে মারাত্মক অপরাধ। এ ধরনের ব্যবসায়ীদের ধ্বংস অনিবার্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِيْنَ، اَلَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ، وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ، أَلاَ يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوْثُوْنَ، لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ، يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ- 'যারা ওযনে কম দেয় তাদের জন্য ধ্বংস। তারা যখন লোকদের কাছ থেকে কিছু মেপে নেয়, তখন পুরাপুরি নেয়। আর যখন তাদের মেপে বা ওযন করে দেয় তখন কম করে দেয়। তারা কি ভেবে দেখে না যে, তারা সেই কঠিন দিনে পুনরুত্থিত হবে, যেদিন সকল মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে' *(মুতাফ্ফিফীন ১-৫)*। আল্লাহ অনত্র বলেন, وَأَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ- 'তোমরা ন্যায্য ওযন কায়েম কর এবং ওযনে কম দিয়ো না' *(আর-রহমান ৯)*। বুঝা গেল যে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ওযনে কম-বেশী করা গুরুতর অপরাধ। এতে এক শ্রেণীর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আর এক শ্রেণীর মানুষ সাময়িকভাবে লাভবান হয়, যা ইসলামে কাম্য নয়।

পরিশেষে বলা যায়, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীকে সততা, ন্যায়-নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে হবে, অবৈধ উপার্জন ও লোভ-লালসাকে সংবরণ করতে হবে। আর এটাই ইসলামের দাবী। মহান আল্লাহ আমাদেরকে সততার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করে ইহকালে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন ও পরকালে মুক্তি লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন!!

৬৫. মুসলিম; মিশকাত হা/২৮৬০।
৬৬. বুখারী, হা/২০৭৯; মুসলিম হা/১৫৩২।
৬৭. বুখারী, মুসলিম, রিয়াযুছ ছালেহীন, হা/১৫৮১।
৬৮. ইসলামে হালাল হারামের বিধান, পৃঃ ৩৪০।

যয়নাব বিনতু খুযাইমা (রাঃ)

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ভূমিকা :

উম্মুল মুমিনীন যয়নাব বিনতু খুযাইমা (রাঃ) ছিলেন অতীব দানশীলা মহিলা। তিনি গরীব-দুঃখী ও দুস্থদের উদার হস্তে দান করতেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় মৃত্যুবরণকারী উম্মুল মুমিনীনদের অন্যতম ছিলেন। তাঁর সৌভাগ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং তার জানাযার ছালাত পড়িয়েছিলেন। দানশীলতার পাশাপাশি ইবাদত-বন্দেগীতেও তিনি ছিলেন অন্যান্য নবী পত্নীগণের ন্যায় অগ্রবর্তী সারিতে। উত্তম চরিত্র মাধুর্যের অধিকারিণী মহিলা ছাহাবী যয়নাব (রাঃ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এ নিবন্ধে আলোচনার প্রয়াস পাব।

নাম ও বংশ পরিচয় :

তাঁর নাম যয়নাব, উপাধি 'উম্মুল মাসাকীন' বা দীন-দুঃখীদের জননী। জাহেলী যুগেও তাঁকে এ নামে ডাকা হ'ত। কারণ তিনি দরিদ্রদের বেশী বেশী খাদ্য দান করতেন।[৬৯] তাঁর পিতার নাম খুযাইমা। তাঁর পূর্ণ বংশ পরিচয় হচ্ছে- যয়নাব বিনতু খুযাইমা ইবনিল হারেছ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আবদে মানাফ ইবনে হেলাল ইবনে আমের ইবনে ছা'ছা'আহ।[৭০] তাঁর মায়ের নাম হিন্দ বিনতু আওফ ইবনিল হারেছ ইবনে হিমাতাহ আল-হুমায়রিয়া।[৭১] তিনি ছিলেন উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রাঃ)-এর বৈপিত্রীয় বোন।[৭২]

জন্ম ও শৈশব :

যয়নাব (রাঃ)-এর জন্মকাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। তবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহের সময় তার বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।[৭৩] সে হিসাবে তাঁর জন্ম ৫৯৫ খৃষ্টাব্দে হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যায়। তাঁর শৈশব-কৈশোর সম্পর্কেও কিছুই জানা যায় না।

প্রথম বিবাহ :

প্রথমে কার সাথে যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। এ ব্যাপারে যে মতগুলি পাওয়া যায় তা হচ্ছে- (১) তুফায়েল ইবনুল হারেছ ইবনিল মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফের সাথে যয়নাব (রাঃ)-এর প্রথম বিবাহ হয়।[৭৪] অতঃপর তুফায়েলের ভাই ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ যয়নাবকে বিবাহ করেন। ওবায়দাহ বদর যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন।[৭৫] (২) তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ। তিনি ওহোদ যুদ্ধে নিহত হন।[৭৬] (৩) তিনি তুফায়েল ইবনিল হারেছের অধীনে ছিলেন। তুফায়েল যয়নাব (রাঃ)-কে তালাক দিলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন। (৪) সীরাতে ইবনে হিশামে আছে, তিনি প্রথমে জাহম ইবনু আমর ইবনিল হারেছ আল-হিলালীর নিকটে ছিলেন। তারপরে ওবায়দা ইবনিল হারেছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিব তাঁকে বিবাহ করেন।[৭৭] (৫) ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ বলেন, রাসূলুল্লাহর পূর্বে তাঁর চাচাদের বংশের দু'জনের সাথে যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল। প্রথমতঃ তুফায়েল ইবনুল হারেছ তাঁকে বিবাহ করেন এবং পরে তিনি তাঁকে তালাক দেন। অতঃপর তার ভাই ওবায়দাহ ইবনুল হারেছ তাঁকে বিবাহ করেন। তিনি বদর যুদ্ধে নিহত হন।[৭৮]

মোদ্দাকথা তুফায়েল যয়নাব (রাঃ)-কে প্রথম বিবাহ করেন। তার সাথে বিচ্ছেদ ঘটলে তার ভাই ওবায়দার সাথে যয়নাব (রাঃ)-এর দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হয়। তিনি বদর যুদ্ধে শহীদ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে যয়নাব (রাঃ)-এর বিবাহ হয়। এটাই প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মত।[৭৯]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহ :

যয়নাব (রাঃ)-এর পূর্বের স্বামীর মৃত্যুর পরে হিজরতের ৩১ মাসের মাথায় তথা ৩য় হিজরীর রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন। রাসূলে কারীম (ছাঃ) তাকে ১২

৬৯. *সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম, ১ম খণ্ড (কায়রো : দারুস সালাম, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), পৃঃ ২৩৭।*

৭০. *আবু আব্দুল্লাহ আল-হাকিম আন-নাইসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০খৃঃ/১৪১১ হিঃ), পৃঃ ৩৬।*

৭১. *ড. আয়েশা আব্দুর রহমান, তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত (বৈরুত : দারুর রাইয়্যান, তা.বি.), পৃঃ ৩১৪।*

৭২. *শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড (বৈরুত : মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ৩য় প্রকাশ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), পৃঃ ২১৮।*

৭৩. *ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।*

৭৪. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮; তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৫।*

৭৫. *সাঈদ আইয়ূব, যাওজাতুন নবী (ছাঃ) (বৈরুত : দারুল হাদী, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭/১৪১৭-১৮ হিঃ), পৃঃ ৬০; মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড (বৈরুত : দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, ১ম প্রকাশ, ১৯৯০খৃঃ/১৪১০ হিঃ), পৃঃ ৯১।*

৭৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮; আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬।*

৭৭. *তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৫।*

৭৮. *ছালাহুদ্দীন মকবূল আহমাদ, আল-মারআতু বায়না হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ই'লাম (কুয়োত : দারু ইলাফ আদ-দাওলিয়া, ১ম প্রকাশ, ১৯৯৭খৃঃ/১৪১৮হিঃ), পৃঃ ২৬৫।*

৭৯. *তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৫।*

উকিয়া[৮০] ও ১ নশ[৮১] মোহর দিয়েছিলেন।[৮২] অন্য বর্ণনায় আছে, যয়নাব (রাঃ)-এর চাচা কাবীছাহ ইবনু আমর আল-হিলালী তাঁকে রাসূলের সাথে বিবাহ দেন। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ৪০০ দেরহাম মোহর দিয়েছিলেন।[৮৩] মাহমূদ শাকের বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহ করেন, তখন তার বয়স ছিল ৬০ বছর। আর এই অধিক বয়সের কারণেই তাকে কেউ বিবাহ করতে চাচ্ছিল না।[৮৪] একথা ঠিক নয়। কেননা সর্বাধিক বিশুদ্ধ মতে, তিনি ৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন।[৮৫] সুতরাং ৬০ বছর বয়সে বিবাহ হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

যয়নাব (রাঃ)-কে বিবাহের কারণ :

যয়নাব (রাঃ)-কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিবাহের পিছনে কতিপয় সামাজিক ও ধর্মীয় কারণ বিদ্যমান ছিল। স্রেফ উপভোগের জন্য হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে বিবাহ করতেন না। কেননা তিনি একদিকে ছিলেন বিধবা এবং অপরদিকে মধ্যম বয়সী।[৮৬] এছাড়া তিনি অতীব সুন্দরী বা অধিক জ্ঞানবতী বিদুষী মহিলাও ছিলেন না।[৮৭] তাকে বিবাহ করার অন্য কারণ ছিল। তন্মধ্যে কতিপয় কারণ নিম্নে উদ্ধৃত হ'ল।- (১) যয়নাব (রাঃ)-এর স্বামীর ইন্তিকালের পরে তিনি আশ্রয়হীন হয়ে পড়েন। তাঁকে বিবাহ করতে তেমন কেউ রাযী ছিল না। তেমনি তাঁর পরিবারের কেউ তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করেনি। কারণ তখনও তাঁর পরিবারের কেউ ইসলাম গ্রহণ করেনি। এমতাবস্থায় যয়নাব (রাঃ) নিদারুণ আর্থিক সংকটে নিপতিত হন। তাঁর ভরণ-পোষণে সমস্যা দেখা দেয়। ফলে অসহায় যয়নাব (রাঃ)-কে আশ্রয় দিতে এবং তাঁর অসহায়ত্ব দূর করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন।[৮৮] (২) যয়নাব (রাঃ)-এর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেছিলেন। কেননা তার পূর্ব স্বামী ছিল রাসূলের চাচাত ভাই।[৮৯] (৩) বদর যুদ্ধে তার নির্ভীক বীর স্বামী শহীদ হওয়ায় তার অন্তরে যে ব্যথা সৃষ্টি হয়, তা দূরীভূত করে তার হৃদয়কে প্রশান্ত করা ও তার প্রতি সহানুভূতি স্বরূপ রাসূল (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন।[৯০] (৪) যয়নাব (রাঃ)-এর পিতৃবংশ হাওয়াযেন-এর বনু আমির শাখার সাথে সম্পর্ক স্থাপনের মানসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে স্ত্রীত্বে বরণ করেন।[৯১]

রাসূলের নিকটে অবস্থান :

রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে তিনি কতদিন অবস্থান করেছিলেন এ ব্যাপারে কয়েকটি মতামত পাওয়া যায়। (১) মাহমূদ শাকের বলেন, وعاشت عنده عامين ثم توفيت فى حياته، 'তিনি রাসূলের নিকটে দু'বছর জীবন যাপন করেন। অতঃপর রাসূলের জীবদ্দশায়ই তিনি ইন্তিকাল করেন'।[৯২] (২) হাকিম নাইসাপুরী বলেন, و لم تلبث عنده إلا يسيرًا، 'তিনি রাসূলের নিকটে অল্প দিন অবস্থান করেন'।[৯৩] (৩) হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, لم تمكث عنده إلا شهرين أو أكثر، 'তিনি রাসূলের নিকট কেবল দু'মাস বা তার চেয়ে কিছু বেশী দিন অবস্থান করেন'।[৯৪] (৪) সাইয়্যেদ আব্দুল্লাহ জরদানী বলেন, و لم تلبث عنده إلا شهرين أوثلاثة ثم مات، 'তিনি রাসূলের নিকটে শুধু দু'মাস বা তিন মাস অবস্থান করেন। অতঃপর মৃত্যুবরণ করেন'।[৯৫] (৫) ইবনু সা'দ ও ইবনুল কালবী বলেন, فمكث عنده ثمانية أشهر، 'অতঃপর তিনি রাসূলের নিকটে ৮ মাস অবস্থান করেন'।[৯৬] (৬) হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী ও ইবনুল ইমাদ আল-হাম্বলী বলেছেন, যয়নাব (রাঃ) রাসূলের নিকটে তিন মাস অবস্থান করেন।[৯৭] মোটকথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে যয়নাব (রাঃ) অল্পকাল ছিলেন এবং রাসূলের জীবদ্দশাতেই ইন্তিকাল করেন।[৯৮] তাঁর থেকে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি।[৯৯]

দানশীলতা :

যয়নাব (রাঃ)-এর দানশীলতা ছিল সুপরিজ্ঞাত। ইসলাম গ্রহণের পূর্বেই তিনি স্বীয় কবীলার নিকট দানশীলা হিসাবে

---

৮০. ৪০ দেরহামে এক উকিয়া। দ্রঃ মিশকাত হা/৩২০৩; এক দেরহাম সমান তিন মাসা $1\frac{1}{5}$ রতি। দ্রঃ নূর মুহাম্মাদ আজমী, বঙ্গানুবাদ মিশকাত ৬/১৯৭ পৃঃ।

৮১. এক নশ হচ্ছে অর্ধ উকিয়া বা ২০ দেরহাম। দ্রঃ মিশকাত হা/৩২০৩।

৮২. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯১; যাওজাতুন নবী (ছাঃ), পৃঃ ৬০-৬১; ১২ উকিয়া ১ নশ-এর পরিমাণ হচ্ছে ৫০০ দেরহাম। দ্রঃ মিশকাত হা/৩২০৩।

৮৩. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৬।

৮৪. মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম-২য় খণ্ড (বৈরুত : আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ খৃঃ), পৃঃ ৩৫৮।

৮৫. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৮।

৮৬. আল-মারজাতু বায়না হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইলাম, পৃঃ ২৬৫।

৮৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৬।

৮৮. আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম-২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।

৮৯. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৭।

৯০. আল-মারজাতু বায়না হিদায়াতিল ইসলাম ওয়া গাওয়াতিল ইলাম, পৃঃ ২৬৫।

৯১. তদেব।

৯২. আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম-২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।

৯৩. মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬।

৯৪. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮।

৯৫. ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭; আবু ওমর আব্দুল বার্রও একই মত পোষণ করেন। দ্রঃ আল-ইস্তি'আব, ৪/৪৫৪।

৯৬. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৬; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯১।

৯৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৬।

৯৮. আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৬।

৯৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮।

পরিচিতা ছিলেন। কোন দীন-দুঃখী তাঁর নিকটে এসে খালি হাতে ফিরে যেত না। তিনি গরীব-দুঃখীদের এমনভাবে সেবা-যত্ন করতেন যে, তাঁকে 'উম্মুল মাসাকীন' বা 'গরীবদের জননী' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল।[১০০] ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মধ্যে দান-খয়রাত করার ঐ প্রবণতা অব্যাহত ছিল। দরিদ্র-অভাবী মানুষের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। তাঁর এ অনুপম গুণাবলীর দ্বারা তিনি পৃথিবীতে অমর হয়ে আছেন। তাঁর দানশীলতা সম্পর্কে ড. আয়েশা আব্দুর রহমান বলেন, ঐতিহাসিক ও চরিতকারগণ যয়নাব বিনতু খুযাইমার বিভিন্ন বিষয়ে মতানৈক্য করলেও গরীব-দুঃখীদের প্রতি তাঁর দয়া-দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি-সহমর্মিতার এই উত্তম বিশেষণের ব্যাপারে সকলেই ঐকমত্য হয়েছেন। যত গ্রন্থে যয়নাব বিনতু খুযাইমার নাম উল্লেখিত হয়েছে সেখানেই তাঁর উপাধি 'উম্মুল মাসাকীন' তথা 'দরিদ্রদের জননী' উল্লেখ করা হয়েছে।[১০১] রাসূলের স্ত্রী হিসাবে বরিত হওয়ার পরও রাসূলের সেবা ও অন্তঃপুরের ব্যস্ততা গরীব-দুঃখীদের সেবা-যত্ন থেকে তাঁকে দূরে সরাতে পারেনি। এ গুণ আমৃত্যু তাঁর মাঝে বিদ্যমান ছিল।[১০২]

রাসূলের আনুগত্য ও অল্পে তুষ্টি :

ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূল (ছাঃ)-এর প্রতি তাঁর আনুগত্য ছিল অকৃত্রিম ও অতুলনীয়। রাসূলের স্ত্রী হওয়ার মর্যাদা তিনি লাভ করেছিলেন, এজন্য তার মনে কোন অহংকার ছিল না। তিনি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট থেকে যা পেতেন তার প্রতিই সন্তুষ্ট থাকতেন। অল্পে তুষ্টির এ উত্তম গুণ তাঁর মধ্য ছিল সদা অমলিন। কোন উচ্চাভিলাষ ও কোন আত্মঅহংকার তাঁর ঐ উত্তম বিশেষণ থেকে তাঁকে বিচ্যুত করতে পারেনি। বরং সরল-সহজ, অনাড়ম্বর ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন-যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।[১০৩]

ইন্তিকাল ও দাফন :

যয়নাব (রাঃ)-এর মৃত্যু সন নিয়েও কিছুটা মতবিরোধ রয়েছে। ইবনুল কালবী বলেন, وماتت فى ربيع الآخر سنة أربع 'তিনি ৪র্থ হিজরীর রবীউল আখির মাসে ইন্তিকাল করেন'।[১০৪] ইবনু সা'দ বলেন, وتوفيت فى آخر شهر ربيع الآخر على رأس تسعة وثلاثين شهرًا– 'তিনি হিজরতের ৩৯ মাসের মাথায় রবীউল আখির মাসের শেষে মৃত্যুবরণ করেন'।[১০৫] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর।[১০৬] ড. আয়েশা আব্দুর রহমান বলেন, والراجح انها ماتت فى الثلاثين من عمرها– 'অগ্রাধিকারযোগ্য কথা হচ্ছে যে, তিনি ৩০ বছর বয়সে ইন্তিকাল করেন'।[১০৭]

উম্মুল মুমিনীনদের মধ্যে খাদীজা (রাঃ) প্রথম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জীবদ্দশায় ইন্তিকাল করেন, যাকে মক্কার 'জিহুন' নামক স্থানে দাফন করা হয়। অতঃপর যয়নাব বিনতু খুযাইমা (রাঃ) রাসূলের জীবদ্দশায় মদীনায় ইন্তিকাল করেন।[১০৮] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা ছালাত পড়ান। তাঁকে 'বাক্বীউল গারক্বাদে' দাফন করা হয়।[১০৯] যয়নাব (রাঃ)-এর তিন ভাই তাঁর কবরে নেমেছিলেন।[১১০] উম্মুল মুমিনীনের মধ্যে যয়নাব বিনতু খুযাইমাই (রাঃ) ছিলেন ভাগ্যবতী মহিলা, যাকে প্রথম 'বাক্বীউল গারক্বাদে' দাফন করা হয়।[১১১]

উপসংহার :

ইসলামপূর্ব জাহেলীযুগ থেকেই যয়নাব (রাঃ) দুস্থ মানবতার সেবায় ছিলেন নিবেদিতা প্রাণ। ইসলামে দাখিল হওয়ার পর নিবিষ্টমনে মহান আল্লাহ্র ইবাদত করার পাশাপাশি তিনি গরীব-দুঃখী ও অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আর তাঁর এ সৎকাজের সুমহান পুরস্কার আল্লাহ তাকে পার্থিব জীবনে দান করেছেন। তাঁর অসহায়ত্বের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার পাশে এসে দাঁড়ান এবং তাকে স্ত্রী হিসাবে বরণ করেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হওয়ার বিরল সম্মানে ভূষিতা হন। যদিও রাসূলের সাথে তার দাম্পত্য জীবন ছিল অতি অল্প সময়ের; কিন্তু তাঁর সৌভাগ্য হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বয়ং তার জানাযা ছালাত পড়িয়েছেন। পরিশেষে বলব, যয়নাব (রাঃ) তাঁর সংগ্রামী জীবনে সদা দীন-দুঃখীদের পাশে ছিলেন। তাদের প্রয়োজন পূরণই ছিল তাঁর সতত সাধনা। এই অনুপম গুণই তাঁকে অমরত্ব দান করেছে। আল্লাহ আমাদেরকেও তাঁর মত গুণাবলী অর্জনের তাওফীক্ব দিন- আমীন!

---

১০০. তদেব; ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।
১০১. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৭।
১০২. ঐ, পৃঃ ৩১৮।
১০৩. তদেব।
১০৪. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৬।
১০৫. আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯১-৯২, যাওজাতুন নবী (ছাঃ), পৃঃ ৬১।
১০৬. ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭; আত-তাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯২।
১০৭. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৮।
১০৮. তদেব, পৃঃ ৩১৮।
১০৯. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯২; যাওজাতুন নবী (ছাঃ), পৃঃ ৬১; ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৭।
১১০. আত-তাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৯২।
১১১. তারাজিমু সায়্যিদাতি বায়তিন নবুওয়াত, পৃঃ ৩১৮।

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকা :

আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর (রহঃ) পাকিস্তানের একজন খ্যাতিমান আলেমে দ্বীন ও আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভীক মর্দে মুজাহিদ ছিলেন। 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানে'র সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল বিশ্ববরেণ্য এই ব্যক্তিত্ব একাধারে অনলবর্ষী বাগ্মী, সংগঠক, কলমসৈনিক, শিকড় সন্ধানী গবেষক, ধর্মতাত্ত্বিক ও স্পষ্টবাদী রাজনীতিবিদ ছিলেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রচার-প্রসারে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বিশেষ করে আহলেহাদীছ যুবকদের মাঝে ইসলামের রূহ সঞ্চারে তাঁর আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। কাদিয়ানী, শী'আ, ব্রেলভী, বাহাইয়া, বাবিয়া প্রভৃতি ভ্রান্ত ফিরকার বিরুদ্ধে তাঁর ক্ষুরধার লেখনী ছিল 'নীরব টাইমবোমা' সদৃশ। শাহাদতপিয়াসী আহলেহাদীছ আন্দোলনের এই নওজোয়ান সিপাহসালার ১৯৮৭ সালে লাহোরে এক বিশাল ইসলামী জালসায় বক্তৃতারত অবস্থায় বোমা বিস্ফোরণে নিহত হয়ে শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলনে গতিসঞ্চারকারী এই মনীষীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অত্র প্রবন্ধে আলোকপাত করা হ'ল।-

জন্ম :

১৯৪৫ সালের ৩১ মে বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত শিয়ালকোটের আহমদপুরা মহল্লায় এক ধার্মিক ব্যবসায়ী পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। ভাই-বোনের মধ্যে তিনি সবার বড় ছিলেন। তাঁর বাবা হাজী যহূর ইলাহী মুত্তাক্বী-পরহেযগার ও তাহাজ্জুদগুযার ছিলেন।[১১২]

শিক্ষাজীবন :

প্রাথমিক শিক্ষা অর্জনের জন্য তাঁকে প্রথমত দাহারওয়াল গ্রামের এম.বি প্রাইমারী স্কুলে ভর্তি করা হয়। প্রাইমারী স্কুলের পাঠ শেষে উঁচী মসজিদ বাজার পানসারিয়াতে কুরআন মাজীদ হিফয করার জন্য ভর্তি করা হয়। যহীর প্রচণ্ড মেধাবী হওয়ায় মাত্র দেড় বছরে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করেন।[১১৩] মাহবূব জাবেদকে দেয়া জীবনের সর্বশেষ সাক্ষাৎকারে নিজের বাল্যজীবন সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমি শিয়ালকোটের এক ব্যবসায়ী খান্দানে জন্মগ্রহণ করেছি। আমার বাবা যহূর ইলাহী ছালাত-ছিয়ামে অভ্যস্ত এবং ইসলামের প্রতি প্রচণ্ড অনুরক্ত ছিলেন। উনি মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম শিয়ালকোটীর অত্যন্ত আস্থাভাজন ও ভক্ত ছিলেন। এজন্য তিনি বাল্যকালেই আমাকে কুরআনের হাফেয বানানো এবং ইসলামের খিদমত করার জন্য উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। আমি যখন প্রাইমারী স্কুলের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই তখন আমার বাবা আমাকে কোন (মাধ্যমিক) স্কুলে ভর্তি করার পরিবর্তে কুরআন মাজীদ হিফয করার জন্য নিয়োজিত করেন। ঐ সময় আমার বয়স ছিল সাড়ে সাত বছর। আল-হামদুল্লিাহ, আমি নয় বছর বয়সে কুরআন মাজীদ মুখস্থ করি এবং হিফয সমাপনান্তেই রামাযান মাসে তারাবীহ্র ছালাত পড়াতে শুরু করে দেই'।[১১৪]

হিফয সম্পন্ন করার পর তাঁকে 'দারুল উলূম শিহাবিয়াহ' মাদরাসায় ভর্তি করা হয়। এরপর গুজরানওয়ালার বিখ্যাত মাদরাসা 'জামে'আ ইসলামিয়া'য় ভর্তি হন। এখানে তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের খ্যাতিমান মুহাদ্দিছ, পঞ্চাশের অধিকবার বুখারীর দরস প্রদানকারী, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক, 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ (পশ্চিম) পাকিস্তানে'র সাবেক আমীর আল্লামা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর (১৮৯৭-১৯৮৫) কাছে হাদীছের দরস গ্রহণ করেন।[১১৫] আল্লামা যহীর বলেন, 'এরপর আমার বাবা দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের জন্য আমাকে বিভিন্ন মাদরাসায় ভর্তি করান। আমি গুজরানওয়ালার বিখ্যাত মাদরাসা জামে'আ ইসলামিয়াতে দ্বীনী জ্ঞান অর্জনের নবযাত্রা আরম্ভ করি। প্রাথমিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের পর ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামী জ্ঞানের খ্যাতিমান শিক্ষক মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর কাছে হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করি। মাওলানা হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী শুধু জমঈয়তে আহলেহাদীছের আমীরই ছিলেন না; বরং তিনি এ সম্মানও অর্জন করেছিলেন যে, পাক-ভারতের অধিকাংশ আহলেহাদীছ আলেম সরাসরি বা কোন না কোন মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে হাদীছের পাঠ গ্রহণ করেছেন। মাওলানা গোন্দলবীর কাছে হাদীছের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নের পর ধর্মীয় জ্ঞানার্জনের মানসে কিছুদিন (জামে'আ সালাফিয়া) ফয়ছালাবাদেও ছিলাম। বিশেষ করে আমি ওখানে মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল্লাহ্র কাছে মা'কূলাতের গ্রন্থাবলী

---

* *এম.ফিল গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১১২. *মিয়াঁ মুহাম্মাদ ইউসুফ সাজ্জাদ, 'ইয়াদূ কী বারাত', মুমতায ডাইজেস্ট, লাহোর, পাকিস্তান, ইহসান ইলাহী যহীর ও তাঁর শহীদ সাথীবর্গের স্মরণে বিশেষ সংখ্যা-২, অক্টোবর '৮৭, পৃঃ ১১৬।*

১১৩. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬।*

১১৪. *আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর সে আখেরী ইন্টারভিউ, সাক্ষাৎকার গ্রহণে : মাহবূব জাবেদ, মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর '৮৭, পৃঃ ৪২।*

১১৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬; www.wikipedia.org।*

অধ্যয়ন করি। মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফুল্লাহ ফতেহপুর সিক্রি থেকে হিজরত করে ফয়ছালাবাদে এসেছিলেন এবং মা'কূলাতের বিষয়াবলী পড়ানোতে তাঁর পদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমি তাঁর কাছে দর্শন ও মানতিক (যুক্তিবিদ্যা) পড়েছি এবং এই দুই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেছি। ১৯৬০ সালে আমি শুধু ফারেগ হয়েছিলাম তাই নয়; বরং পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে আরবী সাহিত্যে বি.এ (অনার্স) ডিগ্রিও অর্জন করেছিলাম'।[১১৬]

ছয় বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি অর্জন :

আল্লামা যহীর তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন। মাদরাসায় শিক্ষা গ্রহণের পাশাপাশি তিনি ১৯৬০ সালে ফার্সী, ১৯৬১ সালে উর্দূ এবং ১৯৬২ সালে আরবী সাহিত্যে এম.এ ডিগ্রি অর্জন করেন। পরবর্তীতে তিনি দর্শন, ইসলামিক স্টাডিজ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও এম.এ ডিগ্রি লাভ করেন। তাছাড়া করাচী ইউনিভার্সিটি থেকে এল.এল.বি ডিগ্রিও অর্জন করেন। এভাবে একজন মাদরাসাপড়ুয়া হয়েও ছয়টি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি লাভের অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী হন।[১১৭] আল্লামা যহীর বলেন, 'আমি এই মর্যাদায় অভিষিক্ত হয়েছি যে, অল্প সময়ের ব্যবধানে এখন আমার নিকট ৬টি বিষয়ে এম.এ ডিগ্রি আছে এবং আমি এল.এল.বিও করে রেখেছি। দ্বীনী জ্ঞানার্জনের পাশাপাশি আমি মসজিদ ও মাদরাসায় চাটাইয়ে বসে এসব ডিগ্রি অর্জন করেছি'।[১১৮]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি : জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচন

আল্লামা যহীর ১৯৬০ সালে জামে'আ সালাফিয়া (লায়েলপুর, ফয়ছালাবাদ, পাকিস্তান) থেকে ফারেগ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের উদগ্র বাসনায় বাবা-মা ও শিক্ষকদের উৎসাহে ১৯৬৪ সালে দ্বিতীয় পাকিস্তানী ছাত্র হিসাবে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া প্রথম পাকিস্তানী ছাত্র ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ শরীফ আশরাফ, যিনি পরবর্তীতে ওখানকার প্রফেসর হিসাবে কর্মরত ছিলেন। এখানে ভর্তি হওয়ার পর ছয় মাসের মধ্যে যহীর আরবীতে কথা বলা, বক্তব্য দেয়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করেন।[১১৯] আল্লামা যহীর বলেন, 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থানকালে আমি আরবী বলার দক্ষতা অর্জন করি। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমিই একমাত্র অনারব ছাত্র ছিলাম যে বিশ্ববিদ্যালয়ের আরব ছাত্রদের সাথে কোন প্রকার ইতস্ততঃ ছাড়াই আরবী বলত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন আরব ছাত্র একথা বলতে পারত না যে, সে আমার চেয়ে ভাল আরবী বুঝতে বা বলতে পারে। আমার প্রচুর আরবী কবিতা মুখস্থ ছিল এবং আমি কুরআন মাজীদের হাফেযও ছিলাম। এজন্য আরবী ভাষায় খুব সুন্দরভাবে কথা বলতে পারতাম'।[১২০]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যেসব শিক্ষকের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা লাভ করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন- বিশ্ববরেণ্য মুহাদ্দিছ, মুহাক্কিক্ব শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (১৯১৪-১৯৯৯), সঊদী আরবের সাবেক গ্র্যান্ড মুফতী, বিশ্ববিখ্যাত সালাফী বিদ্বান শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ/১৯৯৯), 'আযওয়াউল বায়ান' শীর্ষক তাফসীর গ্রন্থের রচয়িতা শায়খ মুহাম্মাদ আল-আমীন আশ-শানকীতী (১৩২০-১৩৯৩ হিঃ), শায়খ আব্দুল কাদের শায়বাতুল হামদ মিসরী, শায়খ আতিয়্যা মুহাম্মাদ সালিম, শায়খ আব্দুল মুহসিন আল-আব্বাদ প্রমুখ।[১২১]

১৯৬৭ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শরী'আহ অনুষদ থেকে গ্রাজুয়েশন সমাপ্ত করেন। ফাইনাল পরীক্ষায় ৯৩ দশমিক ৫ শতাংশ নম্বর পেয়ে ৯২টি দেশের ছাত্রদের মাঝে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হওয়ার গৌরব অর্জন করেন।[১২২]

ফারেগ হওয়ার পূর্বেই মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট লাভ : একটি বিস্ময়কর ঘটনা

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে আল্লামা যহীর 'আল-কাদিয়ানিয়্যাহ : দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল' (القاديانية دراسات وتحليـــل) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। মূলত এগুলো ছিল তাঁর ঐসব লেকচারের সমাহার, যেগুলো তিনি ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের প্রদান করতেন। কারণ তখন কাদিয়ানীদের ব্যাপারে আরব শিক্ষকদের জ্ঞান ছিল একেবারেই সীমিত। সেজন্য তিনি ধর্মতত্ত্ব ক্লাসে ছাত্রদেরকে এ বিষয়ে লেকচার প্রদান করতেন এবং এগুলো সমৃদ্ধাকারে আরবী পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করতেন।

১১৬. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪২-৪৩।*
১১৭. *মুহাম্মাদ আসলাম তাহের মুহাম্মাদী, 'আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর শহীদ : এক হামাপাহ্লু শাখছিয়াত', মাসিক শাহাদত (উর্দূ), ইসলামাবাদ, পাকিস্তান, বর্ষ ১৫, সংখ্যা ৩, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৬, ১১৮, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩; www. wikipedia.org.*
১১৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।*
১১৯. *মুহাম্মাদ খালেদ সাইফ, 'মাতায়ে দ্বীন ও দানেশ জো লুট গায়ী', মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১২৭; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২।*
১২০. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।*
১২১. *মুহাম্মাদ বাইয়ূমী, আল-ইমাম আল-আলবানী (কায়রো : দারুল গাদ আল-জাদীদ, ১ম প্রকাশ, ১৪২৭ হিঃ/২০০৬), পৃঃ ১৪৩; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৭।*
১২২. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫, ১২৭।*

উক্ত গ্রন্থটি প্রকাশের সময় প্রকাশক যহীরকে বললেন, যদি লেখকের পরিচয়ে 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র'র (طالب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) পরিবর্তে 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ' (خريج الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) লেখা হয়, তাহ'লে এ বইয়ের গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যাবে। আল্লামা যহীর বলেন, 'আমি প্রকাশকের এই আগ্রহের কথা মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন) ভাইস চ্যান্সেলর আল্লামা আব্দুল আযীয বিন বায-এর কাছে ব্যক্ত করলাম। উনি বিষয়টি ইউনিভার্সিটির গভর্নিং বডির কাছে উপস্থাপন করলে আমার বইয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে গভর্নিং বডি এই সিদ্ধান্ত নেন যে, আমার বইয়ে আমার নামের সাথে 'মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় ফারেগ' লেখার অনুমতি দেয়া যায় এবং আমাকে এই অনুমতি প্রদানও করা হ'ল। আমার প্রথম গৌরব এটা ছিল যে, আমি আমার ক্লাসে শিক্ষকদের পরিবর্তে ছাত্রদেরকে কাদিয়ানী মতবাদের উপর লেকচার প্রদান করেছি এবং আমার এই লেকচার সমগ্র বই আকারে আমার ছাত্র জীবনেই প্রকাশিত হয়েছে। আর আমার দ্বিতীয় গৌরব এটা ছিল যে, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো উঁচু মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ফাইনাল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বেই আমাকে 'ফারেগ' সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল। আমার স্মরণ আছে, যখন আমাকে এই সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছিল তখন আমি ভাইস চ্যান্সেলর মহোদয়কে একদিন রসিকতা করে বলেছিলাম, 'মাননীয় শায়খ! যদি আমি ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করি তাহলে এই সার্টিফিকেটের কী হবে'? ভাইস চ্যান্সেলর মুচকি হেসে উত্তর দিয়েছিলেন, 'যদি ইহসান ইলাহী যহীর ফেল করে তাহ'লে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ই বন্ধ করে দিব'। মূলত এটা আমার যোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর আস্থার বহিঃপ্রকাশ ছিল এবং নিজেকে আমি এই আস্থার যোগ্য প্রমাণ করতে কখনো কার্পণ্য করিনি'।[১২৩]

কুয়েতের এক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখন : সাহিত্য পুরস্কার লাভ

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি আরবী পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। এমনকি এ সময় তিনি একটি আরবী পত্রিকাও বের করেন। তিনি কুয়েতের একটি বহুল প্রচারিত আরবী পত্রিকায় ১৯৬৫ সালে ধর্মতত্ত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ লিখে সাহিত্যাঙ্গনে হৈচৈ ফেলে দেন। পরবর্তীতে একই প্রবন্ধ অন্যান্য পত্রিকাও লুফে নেয়। ঐ প্রবন্ধের জন্য তিনি বিশেষ সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হন।[১২৪]

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার প্রস্তাব :

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তাঁর প্রতিভার দ্যুতি ওখানকার আলেমগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন। সেজন্য পাঠ চুকানো মাত্র ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার জন্য তাঁর নিকট প্রস্তাব পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি সবিনয়ে সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দেন। এই সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ না করার কারণ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'সম্ভবত আমার এই প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, আমি দ্বীনের যতটুকু জ্ঞান অর্জন করেছি এবং যা কিছু আমার কাছে আছে তা দিয়ে আমার দেশের সেবা করব। স্বদেশবাসীর কাছে আমার জ্ঞান পৌঁছাব। এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ এবং অপরিসীম দেশপ্রেমের কারণেই আমি মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে থেকে যাওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ না করে পাকিস্তানে চলে এসেছি। কুরআন মাজীদের হুকুমও এই যে, একদল লোক এমন থাকা চাই যারা জ্ঞান অর্জন করে নিজের জাতির লোকদের কাছে ফিরে এসে নিজের অর্জিত জ্ঞান তাদের মাঝে বিতরণ করবে'। অন্য আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে আমার ফিরে আসার একটা উদ্দেশ্য তো এটাও ছিল যে, আমি জমঈয়তে আহলেহাদীছকে সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করব। পাকিস্তানে আমার ফিরে আসার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল, পাকিস্তানে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা। কারণ পাকিস্তান ইসলামের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল'।[১২৫]

সাংবাদিকতা ও প্রবন্ধ লিখন :

দেশে থাকা অবস্থাতেই তিনি বিভিন্ন উর্দূ পত্র-পত্রিকায় কাদিয়ানীদের সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখেন।[১২৬] দেশে ফিরে এসে তিনি 'চাটান', 'লায়ল ওয়া নাহার', 'আক্বদাম', 'কোহেস্তান' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক বিষয়ে উর্দূতে প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। তিনি 'মারকাযী জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তান'-এর মুখপত্র সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম', সাপ্তাহিক 'আহলেহাদীছ' ও 'আল-ইসলাম'-এর সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। তাছাড়া 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ পাকিস্তানে'র মুখপত্র রূপে 'তরজুমানুল হাদীছ' নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকাও

১২৩. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৪-৪৫।*

১২৪. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৭।*

১২৫. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৬।*

১২৬. *ইহসান ইলাহী যহীর, আল-কাদিয়ানিয়্যাহ দিরাসাতুন ওয়া তাহলীল (রিয়াদ : কেন্দ্রীয় দারুল ইফতা, ১৪০৪ হিঃ/১৯৮৪ খৃঃ), পৃঃ ৯।*

বের করেন। এ পত্রিকার তিনি প্রধান সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পালন করেন।[১২৭]

বাগ্মী হিসাবে আল্লামা যহীর :

বাল্যকাল থেকেই ইহসান ইলাহী যহীরের বক্তৃতার প্রতি ঝোঁক ছিল। অনলবর্ষী বাগ্মী হওয়ার স্বপ্নের জাল তিনি আশৈশব বুনতেন। এক সাক্ষাৎকারে এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'বাল্যকাল থেকেই বক্তৃতার প্রতি আমার আগ্রহ ছিল। আমার ফুফা স্বাধীনচেতা এবং মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী (রহঃ)-এর আস্থাভাজন ও ভক্ত ছিলেন। মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর বক্তৃতার কথা আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আলোচিত হ'ত এবং বাল্যকাল থেকেই আমার মনে এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয়েছিল যে, আমিও বড় হয়ে বক্তা হব। এ দৃষ্টিকোণ থেকে মাওলানা আতাউল্লাহ শাহ বুখারীর ব্যক্তিত্ব আমার জন্য অনুপ্রেরণা ছিল। আমি কুরআন মাজীদ মুখস্থ করে তারাবীহ্র ছালাত পড়াতে লাগি। এভাবে কুরআন মাজীদ তেলাওয়াতের মাধ্যমে আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে এবং বয়স ও জ্ঞান বৃদ্ধির সাথে সাথে আমার বক্তৃতাশিল্পও সুদৃঢ় হ'তে থাকে'।[১২৮]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে হজ্জের সময় ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাজীদেরকে হজ্জের মাসআলা-মাসায়েল বর্ণনা করার জন্য মসজিদে নববীতে যহীরের জন্য 'বাবুস সঊদ' (সঊদ দরজা) নির্দিষ্ট ছিল। তিনি সেখানে দাঁড়িয়ে উর্দূতে বক্তৃতা দিতেন। একদিন মসজিদে নববীতে প্রচুর লোক সমাগম হয়। তিনি তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে বক্তৃতা দেয়া শুরু করার পর লক্ষ্য করেন যে, তাঁর চতুর্স্পার্শ্বে ভারতীয় ও পাকিস্তানী হাজীরা ছাড়াও বহু সংখ্যক আরব হাজী অবস্থান করছেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে আরবীতে বক্তব্য দেয়া শুরু করেন। প্রথমে সামান্য বাধো বাধো ভাব হ'লেও দ্রুত তা দূর হয়ে যায় এবং অনুভব করেন যে, তিনি আরবী ভাষায় বক্তব্য দিতে সক্ষম। এরপর থেকে প্রত্যেক বছর হজ্জের মওসুমে আরবীতে বক্তৃতা দিতেন।[১২৯]

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাঈল যুদ্ধের সময় মসজিদে নববীতে আক্রমণের আশংকা দেখা দিলে আল্লামা যহীরের তেজোদীপ্ত ঈমান তাঁর বাগ্মীসত্তাকে জাগিয়ে তুলে। ফলে তিনি সেখানে উপস্থিত লোকদেরকে উদ্দেশ্য করে অগ্নিঝরা বক্তৃতায় বলেন, 'পৃথিবী সবসময় মদীনায় আগন্তুক কাফেলাগুলোর পদভারে মুখরিত হওয়ার খবর শুনত। আর আজ আমরা মদীনার রাস্তাঘাটে ইহুদীদের আক্রমণের খবর শুনছি'। একথা বলার সাথে সাথে উপস্থিত যুবক ও বৃদ্ধদের 'আল-জিহাদ' 'আল-জিহাদ' শ্লোগানে মসজিদে নববী প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। গোটা মদীনায় যেন প্রতিশোধের বহ্নিশিখা প্রজ্বলিত হয়।[১৩০]

মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তাঁর বিদ্যাবত্তা ও বক্তৃতার খ্যাতি দিক-দিগন্তে ছড়িয়ে পড়ে। সেখান থেকে পড়াশুনা শেষ করে দেশে আসার পর তিনি ১৯৬৮ সালে লাহোরের 'প্রাচীন ও প্রথম আহলেহাদীছ জামে মসজিদ' বলে কথিত[১৩১] চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু এ দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর আগুনঝরা জুম'আর খুৎবা শোনার জন্য লাহোরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এ মসজিদে লোকজনের ঢল নামত।[১৩২]

ছাত্রজীবন থেকেই আল্লামা যহীর বক্তব্য দেয়া শুরু করলেও চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই মূলত তাঁর নিয়মতান্ত্রিক বক্তৃতার নবযাত্রা শুরু হয়। মাতৃভাষা পাঞ্জাবী হ'লেও তিনি সবসময় উর্দূতে বক্তৃতা দিতেন। দেশের যে প্রান্তেই বক্তৃতা দিতে যেতেন সেখানেই প্রচুর লোক সমাগম হ'ত। শ্রোতা সংখ্যা লাখ পর্যন্ত ঠেকত। মুক্বাল্লিদরাও তাঁর বক্তব্য শুনতে যেত। যেকোন বিষয়েই বক্তব্য দিয়ে বাজিমাত করতেন। অধিকাংশ মানুষ তাঁকে 'সুরেশে ছানী' (দ্বিতীয় সুরেশ) বলত। বক্তব্যের হক তিনি যথাযথ আদায় করতেন। কুরআন, হাদীছ থেকে দলীল এবং ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর উদাহরণ পেশ করতেন।[১৩৩]

১৯৬৮ সালে আইয়ূব খানের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেও কেউ টুঁ শব্দটি করার দুঃসাহস রাখত না। করলেই জেলে পুরে নাস্তানুবাদ করা হ'ত। এমনই এক দুঃসন্ধিক্ষণে আল্লামা যহীর লাহোরে ঈদের মাঠে এক ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। এ সম্পর্কে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, '১৯৬৮ সালের ঘটনা। আমি মূলত চীনাওয়ালী মসজিদের খতীবের পদে আসীন ছিলাম। সেই সময় ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল। ইকবাল পার্কে- যাকে মিন্টু পার্কও বলা হয়, চীনাওয়ালী মসজিদের খতীব হিসাবে ঈদের জামা'আতে

১২৭. *আহমাদ শাকির, 'আল-ই'তিছাম কী চালীসবেঁ জিলদ কা আগায মাযী আওর হাল কী মুখতাছার সারগুযাশত' (সম্পাদকীয়), সাপ্তাহিক 'আল-ই'তিছাম', বর্ষ ৪০, সংখ্যা ১-২, ১-৮ জানুয়ারী ১৯৮৮, লাহোর, পাকিস্তান, পৃঃ ৪; মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮-১৯; বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৫, ১১৮; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২।*

১২৮. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩।*

১২৯. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৪৩-৪৪।*

১৩০. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২-২৩।*

১৩১. *মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন (পিএইচ.ডি থিসিস), পৃঃ ৩৮২।*

১৩২. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১১৮; শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*

১৩৩. *প্রফেসর মুহাম্মাদ ইয়ামীন মুহাম্মাদী, 'ইসলাম কা বেবাক সিপাহী, বেমেছাল মুছান্নিফ ইহসান ইলাহী' মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৭।*

ইমামতি করার দায়িত্ব পেয়েছিলাম। মাওলানা দাউদ গযনবীর সময় থেকেই ইকবাল পার্কের ঈদের জামা'আতকে লাহোরে 'ঈদে আযাদগাঁ' রূপে আখ্যা দেয়া হ'ত এবং এখানকার জামা'আত লাহোরের কয়েকটি বড় ঈদের জামা'আতের মধ্যে গণ্য হ'ত। ১৯৬৮ সালে যখন এই দেশের জনগণ ফিল্ড মার্শাল আইয়ূব খানের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ ছিল এবং তাঁর শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছিল, তখন ঈদের কয়েকদিন পূর্বে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ আনওয়ার (রহঃ)-এর বিরুদ্ধে পুলিশের উদ্ধত আচরণের কারণে লাহোর শহরে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও উত্তেজনা দানা বেঁধে উঠেছিল। লোকদের প্রত্যাশা ছিল, ঈদে আযাদগাঁর খুৎবায় আইয়ূব খানের সরকারকে সমালোচনার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হবে। এজন্য ঈদের পূর্বেই আমার কাছে প্রতিনিধি দল আসা শুরু হয়ে যায়। কিছু লোকের ধারণা ছিল, আমি রাজনীতিবিদ নই। সুতরাং আমি অনুমতি দিলে তারা ওখানকার খুৎবার জন্য এমন ব্যক্তিকে নিয়ে আসবেন যিনি ঐ ঈদের জামা'আতের ইমামের মর্যাদা, ভাবমূর্তি ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখবেন। এ প্রেক্ষিতে আমি ঐ বন্ধুদের নিশ্চিন্ত থাকতে বলি। ঈদের খুৎবায় আমি যে বক্তব্য দিয়েছিলাম তাকে আমার প্রথম রাজনৈতিক বক্তব্যও বলা যেতে পারে। আমার ঐ বক্তব্যের প্রভাব এতই গভীর ছিল যে, (বক্তব্যের পর) অনেক মানুষ আবেগের আতিশয্যে নিজেদের জামা ছিঁড়ে ফেলেছিল। আমার স্মরণ আছে, আগা সুরেশ কাশ্মীরীও ঈদের খুৎবার শ্রোতা ছিলেন। ঈদের ছালাতের পর আমাকে উনি মিয়াঁ আব্দুল আযীয বার এট ল-এর সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলতে শুরু করেন, 'আমি নিজেই বক্তৃতা শিল্পে অনেক দক্ষতা রাখি। কিন্তু আমি দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলতে পারি, ইহসান ইলাহী! যদি তুমি ভবিষ্যতে বক্তৃতা দেয়া ছেড়েও দাও তাহ'লে তোমার এই এক বক্তৃতার দ্বারাই তোমাকে পাক-ভারতের কতিপয় বড় বক্তাদের মাঝে গণ্য করা যেতে পারে'।[১৩৪]

মিয়াঁ আব্দুল আযীয ঐ সময় বলেছিলেন, 'যদি পাক-ভারতের বাগ্মীদের উল্লেখযোগ্য বক্তব্যগুলোকে একত্রিত করা হয় তাহ'লে এই বক্তব্যই শীর্ষস্থানে থাকবে'।[১৩৫]

১৯৮৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার এশার ছালাতের পর ইকবাল রোর্ড শিয়ালকোটে অবস্থিত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে ষষ্ঠ কুরআন ও হাদীছ মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে আল্লামা যহীর তাওহীদের উপর এক গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রদান করেন। মাসূনন খুৎবা ও আঊযুবিল্লাহ-বিসমিল্লাহ পাঠের পর কুরআন মাজীদের সূরা আ'রাফের ১৫৮ নং আয়াত তেলাওয়াতের মাধ্যমে তিনি বক্তব্য শুরু করেন। এ বক্তব্যে তিনি বলেন, 'আমাদের নিকট জীবিত ব্যক্তিদেরকে ভয় করাও শিরক এবং মৃত ব্যক্তিদেরকে ভয় করাও শিরক। আমরা তাওহীদের তত্ত্বাবধায়ক আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকেই ভয় করি না। আর যে ব্যক্তি নিজের মনের মধ্যে চিরস্থায়ী চিরঞ্জীবের ভয় স্থান দেয়, তিনি তাকে সৃষ্টিজগতের ভয় থেকে মুক্ত-স্বাধীন করে দেন। এই শিক্ষাই আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) দিয়েছেন'। তিনি আরো বলেন, 'শুনুন! তাওহীদের সবচেয়ে বড় উপকারিতা এই যে, তাওহীদী আক্বীদা পোষণের পর মানুষ গায়রুল্লাহ্‌র ভয় থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়ে যায়। এরপর আর কাউকে ভয় করে না। কারণ তাওহীদপন্থীর এ দৃঢ় বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُــوَ يُحْيِىْ وَيُمِيْــتُ 'তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত অন্য কোন (হক্ব) ইলাহ নেই। তিনিই জীবিত করেন এবং তিনিই মৃত্যু দান করেন' *(আ'রাফ ১৫৮)*। মৃত্যুও তাঁর আয়ত্বাধীন এবং জীবনও তাঁর আয়ত্বাধীন। তিনি ব্যতীত কেউ মারতে পারেন না, কেউ জীবিত করতেও পারে না। যার বিশ্বাস এরূপ হবে সমগ্র সৃষ্টিজগত তার কিছুই করতে পারবে না'। এরপর আহলেহাদীছদেরকে সম্বোধন করে তিনি দরদমাখা কণ্ঠে বলেন,

اهل حديثو! الله كا تم پر انعام ہے كہ تم توحيدوالوں كے گھر ميں پيدا ہوئے ہو. تمھيں نہيں معلوم توحيد كى قدر كيا ہے؟ توحيد كى قدر كسى سے پوچھنى ہے تو اس سے پوچھو جس كو الله نے بعد ميں هدايت دى ہے.

'আহলেহাদীছগণ! তোমাদের প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ হ'ল তোমরা তাওহীদপন্থীদের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছ। তাওহীদের মূল্য কি- তা তোমাদের জানা নেই? তাওহীদের মূল জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যাকে আল্লাহ পরে হেদায়াত দান করেছেন'।

او لوگو! توحيد كى قدر پوچھنى ہے تو ان سے پوچھو، جو شرك كى پستيوں سے نكل كر توحيد كى بلنديوں پہ آئے. اهل حديثو! كعبہ كے رب كى قسم، تم زندگى كى آخرى لمحات تك اگر خدا كا شكر ادا كرتے رہو، تو اس كے كئے هوئے انعام كا شكر ادا نہيں كر سكتے كہ الله نے تمھيں اپنى توحيد كا علمبردار بنايا ہے.

'ওহে লোকসকল! তাওহীদের মূল্য জানতে চাইলে ঐ ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস কর যে শিরকের নীচুতা থেকে বের হয়ে তাওহীদের উচ্চতায় পৌঁছেছে। আহলেহাদীছগণ! কা'বার প্রতিপালকের কসম! তোমরা যদি জীবনের শেষ মুহূর্ত

১৩৪. *মুমতায ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ৫২।*
১৩৫. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২৩।*

পর্যন্ত আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করতে থাক তাহ'লেও তাঁর কৃত (এই) অনুগ্রহের শুকরিয়া আদায় করতে পারবে না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় তাওহীদের ধারক-বাহক বানিয়েছেন'। তিনি আরো বলেন, 'আজ আমাদের দেশ, জাতি ও জনগণের যত অসুখ আছে সেগুলোর মূল হ'ল শিরক'।[১৩৬]

আরবী ভাষাতেও আল্লামা যহীর চমৎকার বক্তৃতা দিতেন। যখন তিনি এ ভাষাতে বক্তব্য দিতেন তখন মনে হ'ত এটা তাঁর মাতৃভাষা। বিভিন্ন আরব রাষ্ট্রে তিনি আরবীতে বক্তৃতা দিয়েছেন। আরবী ভাষার বড় বড় পণ্ডিত তাঁর আরবী বক্তৃতা শুনে প্রভাবিত হয়েছে। একজন অনারবের মুখ থেকে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বক্তৃতা শুনে তারা বিস্ময়াভিভূত হয়ে যেত। মোদ্দাকথা, তিনি আরবী ও উর্দূ উভয় ভাষায় প্রথমসারির বক্তা ছিলেন।[১৩৭] ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বাঁধলে তিনি মসজিদে নববীতে জিহাদের উপর এক জ্বালাময়ী বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁর বক্তৃতায় মুগ্ধ হয়ে ওখানে উপস্থিত আরব বিশ্বের খ্যাতিমান বাগ্মী, অশীতিপর আলেম, 'আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা' গ্রন্থের লেখক ড. মোস্তফা আস-সিবাঈ বক্তব্য শেষে তাঁর কপালে স্নেহচুম্বন দিয়ে বলেছিলেন, أنا خطيب العرب وأنت أخطب منى. 'আমি আরব বিশ্বের বড় বাগ্মী আর তুমি আমার চেয়েও বড় বাগ্মী'।[১৩৮]

মুবাল্লিগ হিসাবে যহীর ঃ

আল্লামা যহীর একজন বড় মাপের মুবাল্লিগ ছিলেন। দ্বীনের তাবলীগের জন্য তিনি পাকিস্তানের শহর-নগর, গ্রাম-গঞ্জ সর্বত্র বক্তব্য দিয়েছেন। হাযার হাযার লোক তাঁর বক্তব্য শুনে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের নিকটবর্তী হয়েছে। যারা বংশগতভাবে মুসলমান ছিল তারা আমলী মুসলমানে পরিণত হয়েছে। বহু লোক তাঁর বক্তব্য শুনে শিরক-বিদ'আত ছেড়ে তাওহীদের আলোকোজ্জ্বল পথে ফিরে এসেছে। বিশ্বের বিভিন্ন কনফারেন্সে তিনি পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেছেন এবং অসংখ্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দিয়েছেন। সঊদী আরব ও অন্যান্য আরব রাষ্ট্র ছাড়াও তিনি বেলজিয়াম, হল্যান্ড, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স, জার্মানী, ইংল্যান্ড, যুগোশ্লাভিয়া, ভিয়েনা, ঘানা, নাইজেরিয়া, কেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, হংকং, থাইল্যান্ড, আমেরিকা, চীন, ইরান, আফগানিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ প্রভৃতি দেশে বিভিন্ন সেমিনার-সিম্পোজিয়াম ও কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য তাবলীগী সফর করেছেন।[১৩৯]

[চলবে]

১৩৬. *হাফেয হাফীযুল্লাহ, 'শিয়ালকোট মেঁ শহীদে মিল্লাত হযরত আল্লামা ইহসান ইলাহী যহীর কা আখেরী ইয়াদগার খেতাব', মুমতাযে ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ৩৮-৫২।*

১৩৭. *মুমতাযে ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২২, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৭-১৮।*

১৩৮. *শাহাদত, মার্চ ২০০৮, পৃঃ ২২; মুমতাযে ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১২৮।*

১৩৯. *মুমতাযে ডাইজেস্ট, বিশেষ সংখ্যা-২, পৃঃ ১২০, বিশেষ সংখ্যা-১, পৃঃ ১১৮।*

হাদীছের গল্প

আবু নাজীহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ

প্রখ্যাত ছাহাবী আবু নাজীহ আমর ইবনু আবাসাহ আস-সুলামী ইসলামের প্রাথমিক যুগেই ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করে নিজেকে ধন্য করে ছিলেন। মাক্কী জীবনেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন গোপনে ইসলামের দাওয়াত দেন, সে সময় তিনি মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কিছু প্রশ্ন করে নিশ্চিত হন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) আলাহ্র রাসূল, তখন তিনি ইসলাম কবুল করেন। রাসূলের নিকট থেকে দ্বীন সম্পর্কে শিক্ষা নিয়ে তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী নিজ এলাকায় চলে যান। অতঃপর রাসূল মদীনায় হিজরত করলে তিনিও মদীনায় রাসূলের খেদমতে হাযির হন। এ ঘটনা সম্পর্কেই নিম্নের হাদীছ।-

আবু নাজীহ আমর ইবনু আবাসাহ আস-সুলামী (রাঃ) বলেন, জাহেলী যুগ থেকেই আমি ধারণা করতাম যে, লোকেরা পথভ্রষ্টতার উপর রয়েছে এবং এরা কোন ধর্মেই নেই, আর ওরা প্রতিমা পূজা করছে। অতঃপর আমি এক ব্যক্তির ব্যাপারে শুনলাম যে, তিনি মক্কায় অনেক আশ্চর্য খবর বলছেন। সুতরাং আমি আমার সওয়ারীর উপর বসে তাঁর কাছে এসে দেখলাম যে, তিনি আলাহ্র রাসূল (ছাঃ)। তিনি গোপনে (ইসলাম প্রচার করছেন), আর তাঁর সম্প্রদায় (মুশরিকরা) তাঁর প্রতি দুর্ব্যবহার করছে। সুতরাং আমি বিচক্ষণতার সাথে কাজ করলাম। আমি মক্কায় তাঁর কাছে প্রবেশ করলাম। অতঃপর আমি তাঁকে বললাম, আপনি কে? তিনি বললেন, 'আমি নবী'। আমি বললাম, নবী কি? তিনি বললেন, 'আমাকে মহান আলাহ প্রেরণ করেছেন'। আমি বলাম, কি নির্দেশ দিয়ে প্রেরণ করেছেন? তিনি বললেন, 'জ্ঞাতিবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা, মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা, আলাহ্কে একক উপাস্য মানা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক না করার নির্দেশ দিয়ে'। আমি বললাম, এ কাজে আপনার সঙ্গে কে আছে? তিনি বললেন, 'একজন স্বাধীন এবং একজন কৃতদাস'। তখন তাঁর সঙ্গে আবু বকর ও বিলাল (রাঃ) ছিলেন। আমি বললাম, আমিও আপনার অনুগত। তিনি বললেন, 'তুমি এখন এ কাজ কোন অবস্থাতেই করতে পারবে না। তুমি কি আমার অবস্থা ও লোকেদের অবস্থা দেখতে পাও না? অতএব তুমি (এখন) বাড়ি ফিরে যাও। অতঃপর যখন তুমি আমার জয়ী ও শক্তিশালী হওয়ার সংবাদ পাবে, তখন আমার কাছে এসো'।

সুতরাং আমি আমার পরিবার-পরিজনের নিকট চলে গেলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় চলে এলেন। আর আমি স্বপরিবারেই ছিলাম। অতঃপর আমি খবরাখবর নিতে আরম্ভ করলাম এবং যখন তিনি মদীনায় আগমন করলেন, তখন আমি (তাঁর ব্যাপারে) লোকেদেরকে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম। অবশেষে আমার পরিবারের কিছু লোক মদীনায় এল। আমি বললাম, ঐ লোকটার অবস্থা কি, যিনি (মক্কা ত্যাগ করে) মদীনায় এসেছেন? তারা বলল, লোকেরা তাঁর দিকে ধাবমান। তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে হত্যা করার ইচ্ছা করেছিল; কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হয়নি।

অতঃপর আমি মদীনায় এসে তাঁর খিদমতে হাযির হ'লাম। তারপর আমি বললাম, 'হে আলাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনি কি আমাকে চিনতে পেরেছেন? তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি তো ঐ ব্যক্তি, যে মক্কায় আমার সাথে সাক্ষাৎ করেছিলে'। আমি বললাম, হে আলাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আলাহ তা'আলা আপনাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন এবং যা আমার অজানা, তা আমাকে বলুন? আমাকে ছালাত সম্পর্কে বলুন? তিনি বললেন, 'তুমি ফজরের ছালাত পড়। তারপর সূর্য এক বলম বরাবর উঁচু হওয়া পর্যন্ত বিরত থাকো। কারণ তা শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যভাগে উদিত হয় (অর্থাৎ এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং সে সময় কাফেররা তাকে সিজদা করে। পুনরায় তুমি ছালাত আদায় কর। কেননা ছালাতে ফিরিশতা সাক্ষী ও উপস্থিত হন, যতক্ষণ না ছায়া বলমের সমান হয়ে যায়। অতঃপর ছালাত থেকে বিরত হও। কেননা তখন জাহান্নামের আগুন উস্কানো হয়। অতঃপর যখন ছায়া বাড়তে আরম্ভ করে, তখন ছালাত আদায় কর। কেননা এ ছালাতে ফিরিশতা সাক্ষী ও উপস্থিত হন। পরিশেষে তুমি আছরের ছালাত আদায় কর। অতঃপর সূর্যাস্ত পর্যন্ত ছালাত আদায় করা থেকে বিরত থাকো। কেননা সূর্য শয়তানের দু'শিং-এর মধ্যে অস্ত যায় (অর্থাৎ এ সময় শয়তানরা ছড়িয়ে পড়ে) এবং তখন কাফেররা তাকে সিজদা করে'।

পুনরায় আমি বললাম, 'হে আলাহ্র নবী (ছাঃ)! আপনি আমাকে ওযূ সম্পর্কে বলুন? তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে যে কেউ পানি নিয়ে (হাত ধোয়ার পর) কুলি করবে এবং নাকে পানি নিয়ে ঝেড়ে পরিস্কার করবে, তার চেহারা, তার মুখ এবং নাকের গুনাহসমূহ ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন আলাহ্র আদেশ অনুযায়ী তার চেহারা ধৌত করে, তখন তার চেহারার পাপরাশি তার দাড়ির শেষ প্রান্তের পানির সাথে ঝরে যায়। তারপর সে যখন তার হাত দু'খানি কনুই পর্যন্ত ধোয়, তখন তার হাতের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যখন তার মাথা মাসাহ করে, তখন তার মাথার পাপরাশি চুলের ডগার পানির সাথে ঝরে যায়। তারপর সে যখন তার পা দু'খানি গাঁট পর্যন্ত ধৌত করে, তখন তার পায়ের পাপরাশি তার আঙ্গুলের পানির সাথে ঝরে যায়। অতঃপর সে যদি দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করে, আলাহ্র প্রশংসা ও তাঁর মাহাত্ম্য বর্ণনা করে, যার তিনি যোগ্য এবং অন্তরকে আলাহ তা'আলার জন্য খালি করে, তাহ'লে সে ঐ দিনের মত নিষ্পাপ হয়ে বেরিয়ে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল।

তারপর আমর ইবনে আবাসাহ (রাঃ) এ হাদীছটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবী আবু উমামা (রাঃ)-এর নিকট বর্ণনা করলেন। আবু উমামাহ (রাঃ) তাঁকে বললেন, হে আমর ইবনে আবাসাহ! তুমি যা বলছ, তা চিন্তা করে বল! একবার ওযূ করলেই কি এই ব্যক্তিকে এতটা মর্যাদা দেওয়া হবে? আমর বললেন, হে আবূ উমামাহ! আমার বয়স ঢের হয়েছে, আমার হাড় দুর্বল হয়ে গেছে এবং আমার মৃত্যুও নিকটবর্তী। (ফলে এ অবস্থায়) আলাহ তা'আলা অথবা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি মিথ্যা আরোপ করার কি প্রয়োজন আছে? যদি আমি এটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট থেকে একবার, দু'বার, তিনবার এমনকি সাতবার পর্যন্ত না শুনতাম, তাহ'লে কখনই তা বর্ণনা করতাম না। কিন্তু আমি তাঁর নিকট এর চেয়েও অধিকবার শুনেছি' *(মুসলিম হা/৮৩২; নাসাঈ হা/১৪৭, ৫৭২, ৫৮৪; ইবনু মাজাহ হা/২৮৩, ১২৫১, ১৩৫৪; আহমাদ হা/১৬৫৬৬, ১৬৫৭১, ১৬৫৭৮, ১৬৫৮০, ১৮৯৪০)*।

আমর ইবনু আবাসাহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণ ও তাঁর দ্বীনি ইলম অর্জনের প্রতি আগ্রহ-স্পৃহা ছিল অতুলনীয়। আমাদেরকেও তাঁর মত দ্বীনি শিক্ষার্জনে আগ্রহী ও যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। আলাহ আমাদেরকে তাওফীক দান করুন- আমীন!

মুসাম্মাৎ শারমীন আখতার
পিঞ্জুরী, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

বিচার

বসরা শহরের এক গৃহস্থের দুই পুত্র ছিল। বড়জনের নাম হাতেম ও ছোটজনের নাম কাযেম। একবার ব্যবসায় তারা কিছু বাড়তি অর্থ লাভ করল এবং মনে করল বিদেশে সফরে যাবে। দিন তারিখ দেখে তারা দু'ভাই এক সাথে বেরিয়ে পড়ল। তিনদিন সফরের পর তারা এক মুসাফির খানায় আশ্রয় নিল। সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে আবার যাত্রা শুরু করল।

কিছু দূর যেতেই তারা নদীতে একটি পুটলী ভেসে যেতে দেখে উপরে তুলল। খুলে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। পুটলীতে এক হাযার সোনার মোহর ও দু'টি হীরকখণ্ড পেয়ে তারা আল্লাহ্র প্রশংসা করল। স্বর্ণমুদ্রা ও হীরকখণ্ড নিজেরা সমানভাবে ভাগ করে নিল। এরপর আবার চলতে শুরু করল। কিন্তু সঙ্গে এত অর্থ ও মূল্যবান হীরক নিয়ে চলা তারা নিরাপদ মনে করল না। তাই দু'জনে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল যে, ছোট ভাই এগুলোকে নিয়ে বাড়ি ফিরে যাবে। আর বড় ভাই কিসরা নগরে যাবে। হাতেম বলল, এগুলি নিয়ে তুমি বাড়ি গিয়ে তোমার ভাবীর হাতে দিবে। ছোট ভাই কাযেম বাড়ি গিয়ে ভাইয়ের দেওয়া স্বর্ণমুদ্রাগুলি ভাবীর কাছে দিল। কিন্তু হীরকখণ্ড না দিয়ে নিজের কাছে রেখে দিল। এ সম্পর্কে হাতেমের স্ত্রী কিছুই জানতে পারল না।

এদিকে বড় ভাই হাতেম নানা দেশ ঘুরে ব্যবসা-বাণিজ্য করে টাকা-পয়সা ও মালামাল নিয়ে তিন বছর পর দেশে ফিরে এলো। কয়েকদিন পর সে স্ত্রীকে সোনার মোহর ও হীরকখণ্ড সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, কাযেম হীরকখণ্ড দেয়নি। তখন হাতেম কাযেমকে জিজ্ঞেস করল, হীরক খণ্ডের খবর কি? তা তুমি তোমার ভাবীর হাতে দাওনি। কাযেম কসম করে বলল, ভাই আপনার স্ত্রী মিথ্যা বলেছে। কাযেমের কথা বিশ্বাস করে হাতেম তার স্ত্রীকে তিরস্কার করল। হাতেমের স্ত্রী গালাগাল শুনে অপমানিত হয়ে স্বামীকে না জানিয়ে উক্ত শহরের কাযীর কাছে গেল এবং আনুপূর্বিক ঘটনা বর্ণনা করে সুবিচার প্রার্থনা করল।

কাযী হাতেম ও কাযেমকে ডেকে আনলেন এবং তাদের কাছে ঘটনার বিবরণ জানতে চেয়ে সত্য কথা বলার জন্য অনুরোধ করলেন। কাযী কাযেমকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি যখন হীরকখণ্ড হাতেমের স্ত্রীর কাছে হস্তান্তর কর তখন কোন সাক্ষী ছিল কি? সে বলল, হ্যাঁ, দুই জন সাক্ষী ছিল।

কাযী সাক্ষীদেরকে আদালতে হাযির করার হুকুম দিলেন। কাযেম গিয়ে দু'জন লোককে কিছু অর্থ দিয়ে বলল, ভাই তোমরা আমার সঙ্গে আস। কাযীর দরবারে তোমরা সাক্ষ্য দিবে যে, তিনবছর পূর্বে অমুক দিন তোমাদের উপস্থিতিতে আমি আমার বড় ভাইয়ের স্ত্রীকে পাঁচশত সোনার মোহর ও একখণ্ড হীরক দিয়েছিলাম। অর্থের বিনিময়ে সে দুই সাক্ষী কাযীর কাছে মিথ্যা সাক্ষ্য দিল।

কাযী সাক্ষীর পরিপ্রেক্ষিতে রায় দিলেন যে, হাতেমের স্ত্রীর কাছে হীরকখণ্ড রয়েছে। হাতেমকে হুকুম দিলেন তার স্ত্রীর কাছে থেকে তা উদ্ধার করতে।

এমতাবস্থায় হাতেমের স্ত্রী নিরুপায় হয়ে বাদশাহর দরবারে গিয়ে কান্নাকাটি করে বিস্তারিত ঘটনা জানিয়ে সুবিচার চাইল। বাদশাহ বললেন, তুমি কাযীর কাছে গেলে না কেন? সে বলল, হুজুর গিয়েছিলাম। কিন্তু সুবিচার পাইনি। এখন আপনার কাছেও সুবিচার না পেলে স্বামীর ঘরে থাকা আমার দায় হয়ে পড়বে।

বাদশাহ হাতেম, কাযেম ও সাক্ষীদ্বয়কে দরবারে ডাকলেন এবং তাদের কাছে সবকিছু বিস্তারিত জানলেন। কাযেম ও তার সাক্ষীরা আগের মতই সাক্ষ্য দিল।

বাদশাহ হাতেম, কাযেম, দু'সাক্ষী ও হাতেমের স্ত্রীকে জেল-হাজতে ঢুকালেন। তাদের প্রত্যেককে আলাদা আলাদা সেল বা কক্ষে রাখার ব্যবস্থা করলেন। আর প্রত্যেককে কিছু মোম দিয়ে হুকুম দিলেন, হীরকখণ্ডের আকৃতি তৈরী কর, তাহ'লে ছেড়ে দেওয়া হবে।

হাতেম ও কাযেম দুই ভাই মোম দ্বারা অভিন্ন আকৃতির হীরক তৈরী করল। আর সাক্ষীদ্বয়ের হীরকের আকৃতি হ'ল ভিন্ন ভিন্ন। এদিকে হাতেমের স্ত্রী কিছুই তৈরী করতে পারল না। বাদশাহ সবাইকে দরবারে ডেকে মোম নির্মিত হীরকের আকৃতি উপস্থিত করার নির্দেশ দিলেন। দুই ভাই ও সাক্ষীদ্বয়ের তৈরীকৃত হীরক আকৃতি বাদশাহ্র সম্মুখে পেশ করা হ'ল। দরবারের সকলেই দেখল যে, দুই ভাইয়ের হীরকের আকৃতি এক। কিন্তু সাক্ষীদের হীরকের আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন।

তখন বাদশাহ ও দরবারের সকলেই বুঝতে পারলেন যে, সাক্ষীরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছে। তারা হীরক আদৌ দেখেনি। তাই তাদের তৈরী হীরকের আকৃতিতে মিল নেই। তখন বাদশাহ বললেন, হাতেমের স্ত্রীর তৈরী হীরক আকৃতি কোথায়? হাতেমের স্ত্রী ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, হুজুর। আমি তো হীরক কখনই দেখিনি। আমি কিভাবে হীরক আকৃতি তৈরী করব? তাই আমি কিছুই তৈরী করতে পারিনি। বাদশাহ এবং দরবারে উপস্থিত সকলেই বুঝলেন যে, ছোট ভাই কাযেমই হীরকখণ্ড রেখে দিয়েছে এবং অর্থের বিনিময়ে দু'জন মিথ্যা সাক্ষীও হাযির করেছে।

কাযেম হীরকখণ্ডদ্বয় দরবারে হাযির করল এবং দুই হাতে দুই কান ধরে কসম করল যে, আর কোন দিন মিথ্যা কথা বলব না। আমার অন্যায় হয়েছে, আমাকে ক্ষমা করুন। বাদশাহ তাকে মাফ করে দিলেন।

বাদশাহ দু'ভাইকে দু'খণ্ড হীরক দিয়ে বিদায় দিলেন। আর হাতেমের স্ত্রীকে তার সততা ও সাহসের জন্য পুরস্কৃত করলেন। আর সাক্ষীদ্বয়কে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যথাযোগ্য শাস্তি দিয়ে কয়েদখানায় পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর কাযীকে ডেকে বললেন, আপনি সবদিক জেনে-শুনে বুদ্ধি-বিবেচনা করে বিচার করলেন না কেন? সত্য ঘটনা না জেনেই সেই মহিলার কাছ থেকে হীরকখণ্ড আদায় করতে বললেন। এরূপ রায় দেওয়া আপনার উচিত হয়নি।

** শহীদুল্লাহ (ফারূক)*
পিয়ারপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

ক্ষেত-খামার

ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ সজনার চাষ

সজনা বা সজিনা গ্রামবাংলার একটি অতি পরিচিত বৃক্ষ। অতুলনীয় ভেষজ গুণসমৃদ্ধ বৃক্ষটি একদা গ্রামবাংলার প্রতি বাড়ীতে ২/৪টি করে দেখা যেত। কালের প্রবাহে কাঠের দাম বৃদ্ধিজনিত কারণে বসতবাড়ী, রাস্তা-ঘাটে, পুকুর পাড়ে সর্বত্র বিদেশী পরিবেশহানিকর কাঠজাত বৃক্ষ রোপণের হিড়িক পড়ায় অযত্ন, অবহেলায় তা এখন কম চোখে পড়ে। সজনা বৃক্ষ হ'লেও এর থেকে কাঠ পাওয়া যায় না। এর কাণ্ড নরম ও ভঙ্গুর প্রকৃতির। সজনার ঔষধি গুণ অতুলনীয়। এর পাতা, ডাঁটা, ছাল, মূল প্রতিটি অংশই ঔষধি গুণে সমৃদ্ধ। বিশেষ করে রক্তের কোলেস্টরেল হ্রাস, বায়ুপিণ্ডের প্রকোপ হ্রাস, হৃদরোগ ও উচ্চ রক্তচাপ রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকারে এর ঔষধি গুণ ব্যাপক। এর পাতা এবং ডাঁটা বা ছড়া সবজি হিসাবে খুবই উপাদেয় ও মুখরোচক। নিরামিষ মুগ, মসুর কলাই, ফেলন যে কোন ডালের সাথে এর ডাঁটা টুকরা করে কেটে রান্না করলে খুবই সুস্বাদু হয়।

সজনা গাছের ডাল কেটে নিয়ে বর্ষাকালে উঁচু বন্যামুক্ত রোদ পড়ে এমন জায়গায় পুঁতে দিলে তা থেকে শিকড় গজিয়ে গাছে রূপান্তরিত হয়। আবার এর বীজ থেকেও চারা করা যায়। ডাল পুঁতে দিলে যে গাছ হবে তা থেকে ডাঁটা তাড়াতাড়ি ধরবে হেতু ডাল রোপণই উত্তম। দেশের যে কোন স্থানে এমনকি পাহাড়েও তা রোপণ করা যায়। এর পরিচর্যায় তেমন কোন খরচ নেই বললেই চলে। প্রাকৃতিক নিয়মে বেড়ে উঠা গাছের শীতকালে সব পাতা ঝরে যাওয়ার পর গাছে ফুল আসে। সজনা ফুল মৌমাছিদের খুবই প্রিয়। এর থেকে আহরিত মধুর গুণও ভাল।

চৈত্র-বৈশাখ মাসে এর ডাঁটা বা ছড়া খাওয়ার উপযোগী হয়। এ সময়ে গাছে লম্বা ডাঁটা ব্যতীত কোন পাতা থাকে না। ডাঁটা পরিপক্ব হ'তে থাকলে গাছে নতুন পাতা গজায়। এজন্য ডাঁটা সংগ্রহের জন্য ডাল কাটতেও দেখা যায়। ডাল কাটার পরে নতুন পাতা তথা শাখা-প্রশাখা গজিয়ে গাছ পুনঃ সুশোভিত হয়ে যায়। বসত বাড়ীর আঙ্গিনায়, উঠানের পাশে, পুকুর পাড়ে, জমির আইলের পতিত ধরনের যে কোন স্থানে এমনকি শহরের বাসা বাড়ীতে তা রোপণ করলে ডালপালা কম হয় হেতু এর দ্বারা তেমন কোন সমস্যা হয় না। বর্তমানে এক কেজি সজনা ডাঁটার মূল্য ৬০-৮০ টাকা। ভেষজ ঔষধি গুণের কারণে শহরের রসনাবিলাসী লোকেরা তা বেশী দামে কিনে থাকে। এমতাবস্থায় সজনা গাছ রোপণ যথেষ্ট লাভজনক। একটি মাঝারি সাইজের সজনা গাছের ডাঁটা বিক্রিতে বছরে ২/৩ হাযার টাকা অনায়াসে আয় করা যায়। অথচ এর উৎপাদন খরচ নেই বললেই চলে। এর ডাঁটা এমন সময়ে বিক্রি উপযোগী হয় তখন গ্রামবাংলার চৈত্র-বৈশাখ মাসের আকাল থাকে। ঐ সময়ে বেকার গ্রামীণ গরীব পরিবারের আয়ের ক্ষেত্রে তা বিশেষ সহায়ক হয়। এছাড়া পাতা বিক্রিতে প্রায় সারা বছর কিছু কিছু আয় করা যায়। বিশেষ করে বাংলা বছরের চৈত্র সংক্রান্তিতে হিন্দু সম্প্রদায় পাঁচন তৈরির জন্য এর ডাঁটা বেশী বেশী ক্রয় করে থাকে। ঐ সময়ে বিভিন্ন এলাকায় ফড়িয়ারা বাড়ী বাড়ী গিয়ে ঠিকা দামে গাছশুদ্ধ ডাঁটা কিনে থাকে এবং নিজেরাই তা সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এতে অনেকে হাযার হাযার টাকা আয় করে থাকে। যার কারণে এ সবজি বাজারে বিক্রি হবে কিনা এ নিয়ে উৎপাদন বা আবাদকারীকে ভাবতে হয় না। এমনকি তা বিদেশে রফতানীর উজ্জ্বল সম্ভাবনাও রয়েছে।

কাঠের গাছ থেকে ১৫-২০ বছর পর এককালীন টাকা পাওয়া যায়। অথচ সজনা গাছ থেকে প্রতিবছর আয় সম্ভব যা গরীব গৃহস্থের অভাব অনটনের সময় বন্ধুর মতো সহায়তা করে থাকে। এজন্য স্বল্প ভূমির মালিক অথবা ভূমিহীন দরিদ্র বেকারদের জন্য সজনা বৃক্ষ রোপণও আয়ের একটা অবলম্বন হ'তে পারে। যে কোন পরিবারে ১০/১২টি সজনা গাছ থাকা মানে সারা বছর সবজি ও আয়ের নিশ্চয়তা থাকা। দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির বাজারে অলস বসে থেকে কেবল হা-হুতাশ না করে স্বাবলম্বী হ'তে সজনা গাছ লাগানোর মাধ্যমে পারিবারিক সবজির চাহিদা পূরণে প্রণোদনা সৃষ্টি করা দরকার।

দ্বৈত-যৌগ ফলমূল ও সবজি চাষে স্বাবলম্বী

কলার সাথে টমেটো, সীমের সাথে পটল, পেঁপের সাথে হলুদ ও মিষ্টি কুমড়া, গাজরের সাথে লাউ, আঁখের সাথে পিঁয়াজ ও পটল। একই জমিতে দ্বৈত ও যৌগ ফলমূল এবং শাকসবজির চাষ করে লক্ষ্যমাত্রার অধিক ফসল ফলানোর রেকর্ড সৃষ্টি করেছে গাইবান্ধার সাঘাটা উপযেলার পুঁটিমারী গ্রামের চাষী আমীর হোসাইন ব্যাপারী। ১৯৮৪ সালে তিনি মাত্র ৫ কাঠা জমিতে পরীক্ষামূলক চাষবাস শুরু করেন। ফলমূল, শাকসবজি উৎপাদন ও বিক্রয়ের আয় হ'তে তিনি প্রায় তিন একর জমির মালিক হয়েছেন। তার বাড়ির চতুর্দিক আম, জাম, কাঁঠাল, লিচুসহ বিভিন্ন জাতের ফলমূল, শাকসবজি ও গাছ গাছালী ঘেরা একটি সবুজ উদ্যানে পরিণত হয়েছে। বাড়ির উঠান থেকে শুরু হয়েছে ফলমূল ও শাকসবজির বাগান। ফসলভেদে বাগানগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিসরে স্থাপিত হয়েছে। কলা ২ একর ৭৪ শতক, পিঁয়াজ ২০ শতক, সীম ১৭ শতক, টমেটো ৩৬ শতক, আলু ৭০ শতক, ফুলকপি ও পাতাকপি ২০ শতক, গাজর ২০ শতক, পেঁপে ২৫ শতক, আঁখ ১০ শতক, পটল ৩০ শতক, মোট সাড়ে ৮ বিঘা জমিতে ফসল ফলাতে তিনি সর্বসাকুল্যে ৭৫ হাযার টাকা ব্যয় করেছেন। কলা বিক্রি করেই ২ লাখ টাকা আয় হবে, অন্যান্য ফসল হ'তে আয় আসবে ১ লাখ ৫০ হাযার টাকা। কার্তিকের শুরু থেকে সীম তোলা শুরু হয়। প্রতি সপ্তাহে ১০০ কেজি সীম বিক্রি হয়েছে। ১৪ শতক জমিতে সীমের জাংলাসহ খরচ হয়েছে মাত্র ৬ হাযার টাকা। ইতিমধ্যে সীম বিক্রি হয়েছে ৩৫ হাযার টাকা।

আমির হোসাইন সব সময় হাইব্রীড জাতের শাকসবজি ও ফলমূলের আবাদ করেন। তিনি হিরোপ্লাস জাতের টমেটো, স্নোহোয়াট জাতের কপি, ইউনাইটেড (ইংল্যান্ড)-এর পিঁয়াজ, ভারতের রাচির পেঁপে ও আঁখ, হিটারী জাতের বাঁধাকপি, এসি আই-এর আলু আবাদ করেন। তার বাগানে ১৫-২০ হাত লম্বা আঁখ, ৪-৫ কেজি ওযনের কপি, প্রায় দেড় কেজি ওযনের টমেটো হয়েছে। ১৯৮৪ সালে মাত্র ৫ কাঠা জমিতে তিনি ভারতের রাঁচি প্রজাতির পেঁপে রোপণ করে প্রায় দেড়শ মণ পেঁপে ফলাতে সক্ষম হন। এ থেকে প্রায় ১০ হাযার টাকা লাভ হয়। উৎসাহিত হয়ে বিভিন্ন সময়ে কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশ নেন। শুরু করেন হাইব্রীড শস্যের আবাদ। ১৯৮৪ থেকে ২০১১ পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি গড়ে তুলেছেন প্রায় ৮.৫ বিঘা জমিতে উন্নত জাতের শাকসবজি ও ফলমূলের বাগান। তার ছোট্ট ঝুঁপড়ী এখন একটি আধুনিক পাকা বাড়ি। মৎস্য চাষের জন্য পুকুর, গাভী ও ছাগল পালনের জন্য গোয়াল। বর্তমানে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৫০ লাখ টাকা। সরকারিভাবে বিভিন্ন কৃষি মেলা ও প্রদর্শনীতে আমির হোসাইন শ্রেষ্ঠ কৃষক হিসাবে পুরস্কৃত হয়েছেন।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

রসাতলে

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

ঝুলছে গলায় পইতা তাবীয
মুখেতে নেই দাড়ি,
টাখনুর নীচে কাপড় সদা
দেখায় ঈমানদারী।
ছালাত-ছিয়াম ইচ্ছা-খুশী
হলে মনে পড়ি
যাকাত ফিৎরা কিসের ওশর?
নিজের পুঁজি গড়ি।
বিলাস বহুল গাড়ী-বাড়ী
কালো টাকার পাহাড়
নিত্য দিনের রিযিক রুযী
অসৎ পথের আহার।
ঈমান-আমল ছালাত ছিয়াম
গেছে রসাতলে
গযব-দুর্ভোগ নাইকো এর শেষ
মারছে খরা জলে।
মুসলিম আজ অনেক দূরে
ছেড়ে পাক কুরআন,
চলছে দেশে মানব রচিত
আইন ও সংবিধান।
স্বার্থ বুঝে ইসলামকে আজ
করছি ব্যবহার
স্রষ্টা যিনি এক দিন তিনি
হিসাব নিবেন তার।
যত তোমার ক্ষমতার বড়াই
দেখাও বাহাদুরী
একটি সেকেন্ড পাবে নারে
হলে নোটিশ জারী।
পর পারের হিসাব-নিকাশ
সময় থাকতে কর,
রবের বিধান আল-কুরআনের
পথটি সবাই ধর।

***

প্রার্থনা

হাবিলদার মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান
পুলিশ একাডেমী, সারদা, রাজশাহী।

হে প্রভু! দাও শক্তি বেঁচে থাকার মত
সুহালে যেন পেরুতে পারি সামনে বাধা যত।
আসে যদি সামনে শত বাধা নত না হয় যেন শির
অটল থাকার সাধ্য দাও প্রভু মানতে শিক্ষা মহাবীর।
পুষ্পের মত যেন গন্ধ বিলাই সবিতার মত আলো
ধরণীর মাঝে পাই যেন করুণা আশিস যত ভালো।
জীবন গগনে না আসে কভু কাল বৈশাখীর ঝড়
কৃপা করে মোদের দান কর প্রভু যা কিছু কল্যাণকর।
তোমার তরেই সর্বশক্তি তুমিই জগৎস্বামী
তাইতো তোমায় স্মরণ করি অহরহ দিবা-যামী।
পাপী আমি গোনাহ আমার কর মার্জনা
স্রষ্টা তুমি মঞ্জুর কর সৃষ্টির এ প্রার্থনা।

***

আলো ও আঁধার

আল-ইমরান
কোর্টবাড়ী, মীরপুর, ঢাকা।

হে মুসলিম কেন বল
করছি তা সবাই যা করে?
জিজ্ঞাসিত হবে তুমি
কি করেছিলে জীবন ধরে?
তোমার হিসাব তুমি দিবে
অন্য কারোর নয়,
সঠিক পথে চলতে পারলে
হবে তোমার জয়।
ভুল যদি সবাই করে
তবুও তা ভুল
মিথ্যা যদি সবাই বলে
সত্য হবে না তা এক চুল?
ইসলাম হচ্ছে পরিপূর্ণ
নেইতো এত খাদ
নতুন কিছু করলে তা
নিশ্চয়ই বিদ'আত।
বিদ'আত মানে ভ্রষ্টতা
যার পরিণাম জাহান্নাম,
এথেকে মুক্তি পেতে
মেনে চল হাদীছ-কুরআন।
ছালাত পড় জীবন গড়
কুরআন-সুন্নাহ মতে,
পাইবে তবে সঠিক দিশা
থাকবে অহি-র পথে।
কুরআন-হাদীছ পড়লে
তুমি পাইবে সঠিক জ্ঞান
সব সমস্যার অহি ভিত্তিক
পাইবে সমাধান।

***

আল্লাহ্‌র লীলা-খেলা

আতাউর রহমান মণ্ডল
মুংলী, চারঘাট, রাজশাহী।

গাভী খায় রাতে দিনে নানান খাবার
লতাপাতা ঘাস-ভুষি কত নাম তার।
পেশাব-গোবর হয় আলাদা রকম
লাল লহু ঝরে হ'লে গাভী জখম।
গাভীর যবেহ আমি দেখেছি অনেক
কুরবানী মাঠে হয় রক্তের লেক।
গোস্ত হাড্ডি সীনা কলিজা ও মেটে
আলাদা খামাল করে সব কেটে-কুটে।
সেই গাভী দুধ দেয় অমল-ধবল
শিশু খায় শিশু হয় চপল সবল।
যুবক বুড়োরাও ফায়দা ওঠায়
প্রাণরস থাকে তার প্রতিটি ফোঁটায়।
অলৌকিক লীলা খেলা তোমার মা'বূদ
গোস্ত-হাড়ের মাঝে রাখ খাঁটি দুধ।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (গণিত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১। ২০ গ্রাম।
২। পঁচিশ পয়সা ১০০টি ও দশ পয়সা ২০টি।
৩। ৬০ জন।
৪। ছাত্র-ছাত্রী ৬০ জন ও বেঞ্চ ১৮টি।
৫। পূর্বের ৯১ ও পরের ১৯ এবং পার্থক্য ৭২।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)-এর সঠিক উত্তর

১। দাঁত ২। বই ৩। পেট ৪। আনারস

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলামী)

১। পবিত্র কুরআনে কোন নবীর আলোচনা সর্বাধিক স্থানে এসেছে?
২। কওমে মূসা ও ফেরাউনের আলোচনা কুরআনের কয়টি সূরায় কয়টি জায়গায় এসেছে?
৩। ফেরাউন কি কোন ব্যক্তির নাম?
৪। ফেরাউনের লাশের 'মমি' কোথায় সংরক্ষিত আছে?
৫। মূসা ও ফেরাউনের ঘটনা কোন দেশের?

সংগ্রহে : ইমামুদ্দীন
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (ধাঁধা)

১। ছোট্ট একটি ঘরে, হাযার মানুষ ধরে।
২। উত্তরটা সহজ তবু কার আছে জানা
এক পুকুরে দুই পানি খেতে নেই মানা।
৩। উপরে ময়ূরের পেখম নীচে হাতির দাঁত
যে না বলতে পারে সে বোকার জাত।
৪। উপরে পাতা নীচে দড়ি, ইঞ্জিন ছাড়া চলে গাড়ি।
৫। মঙ্গল থেকে আসল খোজা, নীচে লাঠি মাথায় বোঝা।

সংগ্রহে : গোলাম কিবরিয়া
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

ফুদকীপাড়া, পবা, রাজশাহী ৬ এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ আছর পবা থানাধীন ফুদকীপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মক্তবের শিক্ষক জনাব আবু বকরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের আলোচনা পেশ করেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরীর সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হুসাইন।

পাঁজরভাঙ্গা, মান্দা, নওগাঁ ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ যোহর মান্দা থানাধীন পাঁজরভাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন। অনুষ্ঠানে পাঁজরভাঙ্গা আহলে সুন্নাহ হাফিযিয়া মাদরাসার শিক্ষক হাফেয আব্দুল জলীলকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট 'সোনামণি' নওগাঁ যেলা পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আফযাল হুসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আলীম ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়া, রাজশাহী শাখার সহ-পরিচালক যাকারিয়া।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ, বাঁকালে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। সোনামণি যেলা পরিচালক আব্দুল্লাহ আল-মামূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর শূরা সদস্য ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হুসাইন, সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান ও সোনামণি সাতক্ষীরা যেলার দায়িত্বশীলবৃন্দ। অনুষ্ঠানে হাফীযুর রহমানকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি সাতক্ষীরা যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

চাঁদমারী, পাবনা ১৩ এপ্রিল বুধবার : অদ্য বেলা ১২-টায় চাঁদমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার সভাপতি এস.এম. তারিক হাসান-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক বযলুর রহমান। অনুষ্ঠানে আনোয়ার হোসাইনকে পরিচালক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট সোনামণি পাবনা যেলা পরিচালনা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়।

কুরআনই জীবন বিধান

জসীমুদ্দীন
ভাড়ালীপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

সকল বিদ্যা শিখলিরে তুই শিখলি না কুরআন,
বলতে তবু লাজ করে না আমি মুসলমান।
যদিও কুরআন পড়তে শিখিস দায়সারা কোন মতে,
তাজবীদ ছাড়াই যেনতেন রকম ভুল হয় তেলাওয়াতে।
পড়তে জানলেও পড়িস না কুরআন প্রতিনিয়ত,
যারাও বা পড়িস গড়িস না কেন জীবন ইহার মত?
কুরআন কি শুধু তা'বীযের দো'আ ঝাড়-ফুঁকের মন্ত্র?
কুরআন হ'ল ক্বিয়ামত তক পূর্ণ জীবনতন্ত্র।
কৃষ্ণ হরফ পড়লিই শুধু জানলি না অনুবাদ,
আজীবন শুধু বোঝা বইলি চেখে দেখলি না স্বাদ।
জানলি না এর লুকায়িত মর্ম হিকমত আহ্বান
বুঝলি না ইহা বিশ্বের তরে পূর্ণ জীবন বিধান।
যত্ন করে চুমা খেলি লাগালি কপালে বুকে
পড়লি না শুধু শোভা পেল দামী আলমারী তাকে।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

এডিবির আজগুবি তথ্য

মাদরাসাগুলো জঙ্গী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

দেশে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষাকার্যক্রম সময়োপযোগী নয়। শুধু তাই নয় মাদরাসাগুলো পরিণত হয়েছে জঙ্গীদের বড় ধরনের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। গত ২৯ মার্চ রাজধানীর একটি হোটেলে 'এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে'র (এডিবি) অর্থায়নে 'মাদরাসা শিক্ষার সক্ষমতা বৃদ্ধি' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় উপস্থাপিত খসড়া প্রতিবেদনে এ কথা বলা হয়েছে। কর্মশালায় ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ড. মঞ্জুর আহমাদ বলেন, '৭৫-এর পর রাজনৈতিক বিবেচনায় সরকারী অর্থায়নে ধর্মভিত্তিক শিক্ষার সম্প্রসারণ ঘটেছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্যে এটি করা হয়েছে কি-না তা খতিয়ে দেখা দরকার। সরকারী অর্থায়নে সাধারণ শিক্ষার সমান্তরালে এ ধরনের শিক্ষা আর কতটুকু বাড়তে দেয়া উচিত তার সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। যেলা ও উপযেলা পর্যায়ে অন্যান্য ধারার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অনুপাতে মাদরাসা শিক্ষার সম্প্রসারণ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে'। উক্ত খসড়া প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করেন গবেষণা টিমের প্রধান বৃটিশ নাগরিক ক্রিস্টোফার কুমিং।

উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত জমিয়াতুল মোদার্রেছীনের মহাসচিব মাওলানা সাব্বির আহমেদ মমতাজী উক্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ করে বলেন, মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সমীক্ষা ও গবেষণার কথা বলা হচ্ছে, অথচ এখানে মাদরাসা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত কেউ নেই। মাদরাসা বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউসুফ বলেন, এর দ্বারা একটি শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলুষিত করা হচ্ছে। ইহুদী-খৃষ্টানদের টাকায় গবেষণা সমীক্ষার নামে এ ধরনের নির্জলা মিথ্যা তথ্যের কোনই মূল্য নেই বলে দেশের ওলামায়ে কেরাম মন্তব্য করেছেন।

প্রতিদিন নেশায় অপচয় ৫০ কোটি টাকা

'ফ্যামিলি হেলফ ইন্টারন্যাশনালে'র তথ্য মতে, বাংলাদেশে প্রায় ৫০ লাখ মাদকসেবী আছে। পুরুষ, নারী ও শিশু মিলে প্রায় এক লাখ মানুষ মাদক বিক্রি ও পাচারের সঙ্গে জড়িত। একজন মাদকসেবী প্রতিদিন গড়ে ১০০ টাকা খরচ করলে দেশে মাদকের পিছেই ব্যয় দাঁড়ায় দিন ৫০ কোটি টাকা। মাদকের ছোবলে অকালে ঝরে পড়ছে বহু তাজা প্রাণ। মাদকসেবীদের সংগঠন 'নিরন্তর প্রচেষ্টা'র হিসাব অনুযায়ী, গত সাত বছরে রাজধানী ও আশপাশে এক হাযার মাদকাসক্ত মারা গেছে।

মিনারেল ওয়াটারের নামে দূষিত পানি

রাজধানীতে জারে ভর্তি মিনারেল ওয়াটারের নামে খাওয়ানো হচ্ছে দূষিত পানি। এসব পানি পান করে মানুষ পেটের পীড়া, চর্মরোগসহ নানান জটিল রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ছে। হাসপাতালগুলোতে বাড়ছে রোগীর সংখ্যা। বেঁচে থাকার জন্য এখন মানুষকে বাধ্য হয়ে খাবার পানি কিনতে হচ্ছে। বেড়ে গেছে জীবনযাত্রার ব্যয়। অপরদিকে বেসরকারী পর্যায়ে ভেজাল ও দূষিত পানি বিক্রি করে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে প্রতারক পানি ব্যবসায়ীরা। অনেক ক্ষেত্রে ওয়াসার পানিকে ফিল্টারের মাধ্যমে ছেঁকে তা বাজারজাত করা হয়। রাজধানী ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে বৈধ/অবৈধভাবে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠছে এসব কারখানা। মিনারেল ওয়াটারের কারখানা থেকে হালকা নীল রঙের ১৯ লিটার জারে পানি রিফিল করার আগে জীবাণুনাশক (যেমন হাইড্রোজেন পার অক্সাইড) দিয়ে জীবাণুমুক্ত করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও জারপ্রতি বাড়তি ২/৩ টাকা খরচের কারণে তা করা হয় না। জারগুলো ওয়াশিং প্ল্যান্টে না ধুয়ে শুধু পানি দিয়ে হাতে ঝাঁকিয়ে দৃশ্যমান ময়লা পরিষ্কার করা হয়। ফলে কলেরা, আমাশয়, জন্ডিস, টাইফয়েড প্রভৃতি পানিবাহিত জীবাণু ধ্বংস হয় না।

তিন মাসে দেশে ৮৮ জন যৌন হয়রানির শিকার

গত ৩ মাসে সারাদেশে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে ৮৮ জন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করায় কলেজ ছাত্রীসহ নিহত হয়েছে ২ জন এবং আহত হয়েছে ৭৯ জন। 'বাংলাদেশ মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা'র জরিপে এ তথ্য ফুটে উঠেছে। জরিপ মতে, গত মাসে ৩৫ জন, ফেব্রুয়ারীতে ৩০ এবং জানুয়ারী মাসে ২৩ জন যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে। এছাড়া গত মার্চ মাসে যৌতুকের জন্য জীবন দিতে হয় ১৫ জনকে এবং একই কারণে নির্যাতিত হন ৪ জন নারী।

মর্মান্তিক!

বছর তিনেক আগে কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপযেলার শম্ভুপুর গ্রামের আবুল হোসাইনের (৪৫) সঙ্গে বিয়ে হয় একই উপযেলার কালাচান মিয়ার মেয়ে সুরাইয়া আক্তারের (১৬)। এক বছরের মধ্যে তাঁদের একটি কন্যাসন্তান হয়। নাম রাখা হয় সুমাইয়া। কিন্তু জন্মের দুই বছরের মধ্যে বাবার সন্দেহ আর অবিশ্বাসের বলি হ'তে হল নিষ্পাপ সুমাইয়াকে। গত ৩ এপ্রিল সুমাইয়াকে গলা কেটে হত্যা করেন আবুল হোসাইন। জানা গেছে, ঐদিন সকাল নয়টার দিকে সুরাইয়া শিশুটিকে খাটে ঘুম পাড়িয়ে বাইরে যায়। এ সময় আবুল হোসাইন দা দিয়ে গলা কেটে সুমাইয়াকে হত্যা করেন।

বসুন্ধরার সূদমুক্ত ঋণে স্বাবলম্বী মাফিয়া খাতুন

ব্রাহ্মণবাড়িয়া যেলার বাঞ্ছারামপুর উপযেলার মিরপুর গ্রামের মৃত নযরুল মিয়ার স্ত্রী মাফিয়া খাতুন বসুন্ধরা ফাউণ্ডেশনের সূদমুক্ত ঋণে গড়ে তুলেছেন সাবান ফ্যাক্টরি। হাতি মার্কা নামে যে কাপড় কাঁচার সাবানটি গত দুই যুগ ধরে এই অঞ্চলের বাজার একচেটিয়া ধরে রেখেছিল মাফিয়ার তৈরী সাবানের মূল্য তার চেয়ে কম ও মান ভাল হওয়ায় ৬ মাসেই চাহিদার বিপরীতে পাইকাররা মাফিয়ার কাছে অগ্রিম টাকা দিয়ে সাবানের অর্ডার দেন। ছেলে ও দুই মেয়ের জন্য এক সময় তিনি মানুষের দ্বারে দ্বারে সাহায্য চেয়ে বেড়াতেন। তারপর বসুন্ধরার ঋণ নিয়ে তিনি ক্রমেই স্বাবলম্বী হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন, 'মানুষ অহন রাস্তা-ঘাটে দেখলে ক্যামন আছি খোঁজ-খবর লয়'। উল্লেখ্য, বসুন্ধরা ফাউণ্ডেশনের ঋণের জন্য কোন প্রকার সূদ, সার্ভিস চার্জ, ভর্তি ফি, নিরাপত্তা (গ্যারান্টার) দেয়ার জন্য নেই কোন ঝামেলা। সবচেয়ে সুবিধা হল- ঋণ প্রাপ্তির তিন সপ্তাহ পর থেকে ঋণের কিস্তি আদায় শুরু হয় সম্পূর্ণ সূদমুক্তভাবে।

বিদেশ

গুয়ান্তানামো বন্দিদের ওপর মেডিকেল পরীক্ষা চালানোর অভিযোগ

কিউবার গুয়ান্তোনামো বন্দিশিবিরে আটকদের ওপর বিভিন্ন মেডিকেল পরীক্ষা চালায় মার্কিন নিরাপত্তারক্ষীরা। এক সাবেক গুয়ান্তানামো বন্দির এই দাবী নতুন করে বিতর্কের সৃষ্টি করেছে। তুর্কী বংশোদ্ভূত জার্মান নাগরিক মুরাদ কুরনাজ। তার দাবী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পরিচালিত গুয়ান্তানামো বন্দিশিবিরে তার ওপর মেডিকেল পরীক্ষা করা হয়েছিল। শুধু তিনি নন, আরও অনেক বন্দি এই পরীক্ষার শিকার হন। কুরনাজ জানিয়েছেন, কোন কারণ ব্যাখ্যা না করেই তার শরীরে ইনজেকশন দেয়া হ'ত। এতে করে তার আরও বেশী সমস্যা হ'ত। অনেক সময় প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দিত। এমনকি অনেক বন্দিকে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধক দেয়া হয়েছিল। অথচ বন্দিশিবিরে ম্যালেরিয়ার কোন প্রকোপ ছিল না। কুরনাজের মতে, এভাবে বিনা প্রয়োজনে ঔষুধ প্রদানের প্রতিক্রিয়ায় অনেক বন্দি বেলুনের মতো ফুলে উঠত। কারো কারো সারা শরীর ঘামে ভিজে যেত। বন্দিদের ধারণা নতুন উৎপাদিত বিভিন্ন ঔষধ তাদের ওপরে প্রয়োগ করে পরীক্ষা করত মার্কিন নিরাপত্তারক্ষীরা।

ভারত বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমদানীকারক দেশ

ভারত এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অস্ত্র আমদানীকারক দেশ। অস্ত্র প্রতিযোগিতার বাজারে ভারত প্রতি বছর বিশ্বের মোট অস্ত্রের শতকরা নয় ভাগ কিনে নেয়। ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত রয়েছে। 'স্টকহোম ইন্টারন্যাশনাল পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট' এসব তথ্য দিয়েছে। দেশটি গত দুই বছরের চেয়ে এবার সামরিক বাজেট শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়েছে এবং প্রতি বছর চার হাযার কোটি ডলারের অস্ত্র কেনার জন্য অর্থ বরাদ্দ দিয়েছে। ভারতের মোট অস্ত্রের ৭০ ভাগ আমদানী করা। আর আমদানী করা মোট অস্ত্রের শতকরা ৮২ ভাগ আসে রাশিয়া থেকে। এদিকে পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হিসাব অনুযায়ী, বিশ্বে অস্ত্র রফতানির ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে। এর পরেই রয়েছে রাশিয়া ও জার্মানী।

বিশ্বে প্রতি ১০টির মধ্যে একটি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে

বিশ্বের প্রতি ১০টির মধ্যে একটির বেশী পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ব্রিটিশ দৈনিক 'দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট' একথা জানিয়েছে। জাপানে নযীরবিহীন ভূমিকম্প ও সুনামীতে ফুকুশিমা পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে গবেষণা চালানো হয়। গবেষণার ফলাফলে বলা হয়েছে, জাপান, তাইওয়ান, চীন, দক্ষিণ কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্রের ৭৬টি পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র সুনামির ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে রয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে, বিশ্বের ৪৪২টি পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতি দশটির মধ্যে একটির বেশী কেন্দ্র ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

৯টি দেশ থেকে ধর্ম হারিয়ে যাবে

গবেষকদের মতে পৃথিবীর ৯টি দেশ থেকে ধর্ম ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দেশগুলো হচ্ছে- অস্ট্রেলিয়া, অস্ট্রিয়া, কানাডা, চেক প্রজাতন্ত্র, ফিনল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, নেদারল্যান্ডস, নিউজিল্যান্ড এবং সুইজারল্যান্ড। যুক্তরাষ্ট্রের ডালাসে আমেরিকান ফিজিক্যাল সোসাইটির বৈঠকে এই গবেষণা জরিপটি উপস্থাপন করা হয়। এতে দেখা যায়, ঐ দেশগুলোয় ক্রমবর্ধমান হারে ধর্মবিমুখতা বাড়ছে। গবেষক দলের গাণিতিক মডেল ধর্মবিষয়ক প্রশ্নের উত্তর এবং এর পেছনের আর্থ-সামাজিক কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছে। তারা এই দেশগুলোই অন্তত ১০০ বছর আগের তথ্য-উপাত্তও পর্যালোচনা করেছে। গবেষক দলের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েষ্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড্যানিয়েল আব্রামসের একটি দল কাজ করেছে। গবেষণার সংঙ্গে জড়িত অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রিচার্ড উইনার বলেন, বিশ্বের আধুনিক গণতান্ত্রিক দেশগুলোয় ধর্মের সঙ্গে আর সম্পর্ক নেই- এভাবেই মানুষ নিজেদের ভাবতে পসন্দ করে। এই গবেষণায় দেখা যায়, নেদারল্যান্ডসে ধর্মবিমুখ মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০ ভাগ আর চেক প্রজাতন্ত্রে এই সংখ্যা প্রায় ৬০ ভাগ।

ধর্ষণের দায়ে ইসরাঈলের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোশের ৭ বছরের কারাদণ্ড

ধর্ষণের মামলায় ইসরাঈলের সাবেক প্রেসিডেন্ট মোশে কাটসভকে দুই মেয়াদে ৭ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। রায় ঘোষণার সময় ৩৫ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট চিৎকার করে বলেন, এই রায়ে মিথ্যার জয় হয়েছে। এছাড়া আদালত তাকে ২৮ হাজার মার্কিন ডলার আর্থিক জরিমানা করেছেন। অনাদায়ে আরো দুই বছরের কারাভোগের আদেশ দেওয়া হয়েছে। মোশে কাটসভ ৪৫ দিনের মধ্যে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করতে পারবেন। গত বছর ডিসেম্বরে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, বিচার কাজে বাধা দেওয়াসহ বেশ কয়েকটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য বেড়েছে

মার্কিন সিনেটের এক শুনানীতে কয়েকজন কংগ্রেস প্রতিনিধি স্বীকার করেছেন যে, সে দেশে মুসলমানদের নাগরিক অধিকার বিপদাপন্ন হয়েছে। তারা আরও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বৈষম্য ও তাদের স্বাধীনতার অধিকার লংঘন অব্যাহত রয়েছে। শুনানির আয়োজক সিনেটর ডিক দুর্বিন বলেছেন, ১১ সেপ্টেম্বর সন্ত্রাসী হামলার ঘটনার পর মুসলিম জনগোষ্ঠী এবং আরব ও দক্ষিণ এশিয়ার নাগরিকদের বিরুদ্ধে যে বৈষম্য ও দুর্ব্যবহারের জোয়ার শুরু হয়েছিল এখনও তা অব্যাহত রয়েছে। মার্কিন বিচার বিভাগের সহকারী এটর্নি জেনারেল টমাস পেরেয এ বৈঠকে বলেছেন, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে এবং এ বিষয়ে তদন্ত হওয়া উচিত।

মুসলিম জাহান

উত্তাল ইয়েমেন : প্রেসিডেন্ট ছালেহকে বিরোধীদের আল্টিমেটাম

ইয়েমেনের প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ ছালেহকে ক্ষমতা থেকে হটাতে ইয়েমেনে আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। প্রেসিডেন্ট ছালেহ ১৯৭৮ সাল থেকে অদ্যাবধি ৩২ বছর ক্ষমতায় আসীন আছেন। দুর্নীতি, অদক্ষতা, মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় বাধা ও রাষ্ট্রীয় নির্যাতনের প্রতিবাদে পুরো ইয়েমেনে জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে বিক্ষোভ-আন্দোলন চলছে। নগরীর এডেনে এক তরুণ শরীরে আগুন লাগিয়ে দিলে আগুনে ঘৃতাহুতির মতো আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশময়। অবস্থা বেগতিক দেখে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে সেনাবাহিনীর বেতন-ভাতা বৃদ্ধি, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সরকারী ভাতা বাড়ানোর মতো পদক্ষেপও ছালেহ নেন। কিন্তু তাতেও আন্দোলনকারীরা শান্ত না হলে ব্যর্থ-মনোরথ প্রেসিডেন্ট ছালেহ ঘোষণা দিতে বাধ্য হন যে, পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আর রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হবেন না। কিন্তু তাতেও সায় মেলেনি বিরোধীদের। উল্টো 'শেষ সুযোগ' হিসাবে বিরোধীদলগুলোর জোট 'জয়েন্ট মিটিং পার্টিস' (জেএমপি) দেশটির ভাইস প্রেসিডেন্ট আবদ্রাবুহ মানছূর হাদির কাছে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব দিয়েছে। প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভাইস প্রেসিডেন্ট দ্রুত জাতীয় নিরাপত্তাবাহিনী, কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও রিপাবলিকান গার্ড ফোর্সকে পুনর্গঠন করার উদ্যোগ নেবেন। এদিকে সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, বিরোধীরা ছালেহকে ক্ষমতা ছাড়ার জন্য দুই সপ্তাহের আল্টিমেটাম দিয়েছে। এদিকে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে বিরোধীদের সহিংসতায় এ পর্যন্ত দেড়শ'র অধিক নিহত এবং হাযার হাযার আহত হয়েছে। বেশকিছু সরকারী কর্মকর্তা, কূটনৈতিক, নিরাপত্তাবাহিনী ও সেনাসদস্য পদত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেয়ায় এবং উপজাতীয় গোত্রগুলো তাঁর প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করায় ছালেহ দু'চোখে ঘোর অমানিশা দেখছেন।

বাংলাদেশী এক যুবকের প্রচেষ্টায় মালয়েশিয়ায় চারজনের ইসলাম গ্রহণ

বাংলাদেশ থেকে মালয়েশিয়ার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়া বগুড়া শহরের খান্দার এলাকার জনাব মুহাম্মাদ মাহবুবুর রহমানের পুত্র জাহিদের প্রচেষ্টায় চারজন অমুসলিম সম্প্রতি ইসলাম গ্রহণ করেছেন। এঁরা হ'লেন- ডেভিড (৩৪ বছর বয়স্ক এই ইতালীয় নাগরিক পূর্বে ক্যাথলিক ছিলেন), স্টেলা (২৫ বছর বয়স্ক এই চীনা মহিলা বৌদ্ধ ছিলেন), নোং ফং (২৭ বছর বয়স্ক ভিয়েতনামী এই মহিলাও বৌদ্ধ ছিলেন) এবং যোশেফ (৩০ বছর বয়স্ক বার্বাডোজের এই নাগরিক খৃষ্টান ছিলেন)। এরা বিভিন্ন কোম্পানীতে চাকরি করেন। জাহিদ তাদেরকে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ তা বুঝিয়ে দিতেন। তাদের সাথে আলাপের সময় প্রাসঙ্গিক কোন হাদীছ জানা থাকলে তা উল্লেখ করতেন। কুরআন মাজীদ বুঝার জন্য তিনি তাদেরকে কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ পড়তে দেন। অবশেষে জাহিদের আড়াই বছরের প্রচেষ্টায় তাঁরা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফালিল্লাহিল হামদ। উল্লেখ্য, মাহবুবুর রহমান 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর একজন শুভাকাঙ্ক্ষী।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

সেকেন্ডেই চার্জ হবে মোবাইল আর মিনিটে ল্যাপটপ

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা মোবাইল ফোনের ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার এমন একটি পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন যার সাহায্যে সেকেন্ডেই চার্জ সম্পন্ন হবে। থ্রিডি ন্যানো স্ট্রাকচারে নকশা করা এই চার্জিং পদ্ধতি ব্যবহার করে মিনিটের মধ্যেই ল্যাপটপেও চার্জ করা যাবে। থ্রিডি ন্যানো স্ট্রাকচারের নকশা করেন ইউনির্ভাসিটি অব ইলিনয়ের গবেষকরা। তাঁরা জানান, এই প্রযুক্তির মাধ্যমে সার্জারির জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চশক্তির লেজার এবং ডিফেব্রিলেটরও চার্জ করা যাবে। এর ফলে অপারেশন চলাকালেও চার্জ নেওয়া যাবে। গবেষক ব্রাউন জানান, ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার এই পদ্ধতিটি ব্যাটারিতে চার্জ ধরে রাখতে ক্যাপাসিটরের মতো কাজ করতে পারবে। গবেষকদের উদ্ভাবিত এই ইলেকট্রোড পদ্ধতিটি ১০ থেকে ১০০ গুণ দ্রুত চার্জ করতে পারে। জানা গেছে, বর্তমানে প্রচলিত সব ধরনের ডিভাইসেই এই চার্জিং পদ্ধতি ব্যবহার করা যাবে।

সবুজ হয়ে উঠছে অ্যান্টার্কটিকা

সবুজ থেকে সবুজতর হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা। দক্ষিণ মেরুর বরফ ছাওয়া ধবল যমীনে দিন দিন বাড়ছে সবুজের এই বিস্তৃতি। নতুন এক গবেষণার ভিত্তিতে এই তথ্য তুলে ধরে একদল বিজ্ঞানী দাবী করেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ার কারণে বদলে যাচ্ছে দক্ষিণ মেরুর হিমেল রাজ্যের পরিবেশ। যুক্তরাজ্য ও অষ্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীরা এই গবেষণা চালান। বিজ্ঞানীদের দেয়া তথ্যমতে, বড় গাছপালা বলতে যা বোঝায় তার অস্তিত্ব এখানে নেই। তবে ফুল হয় এমন দু'টি উদ্ভিদ গত ৫০ বছরে বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। এগুলো হচ্ছে 'অ্যান্টার্কটিক হেয়ারগ্রাস' নামে এক ধরনের দুর্বাঘাস। অন্যটি 'অ্যান্টার্কটিক পার্লওর্ট', যা এক ধরনের ছোটখাটো ঝুপালো গাছ। অ্যান্টার্কটিকার পশ্চিমাঞ্চলীয় উপদ্বীপ ও আশপাশের দ্বীপে রয়েছে এই উদ্ভিদ দু'টি। এর মধ্যে হেয়ারগ্রাসের বিস্তার বেশ দ্রুত ঘটছে বলে বিজ্ঞানীদের দাবী।

নিয়মিত পরীক্ষায় স্মৃতিশক্তি বাড়ে

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা জানিয়েছেন, নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করলে মস্তিষ্কের ক্ষমতা ও স্মৃতিশক্তি বেড়ে যায়। গবেষকরা আরো জানিয়েছেন, নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ফলে মানসিক শক্তি বা 'মেডিয়েটরস' বেড়ে যায়। এই মেডিয়েটরস বা মানসিক শক্তি কেবল পড়াশোনার মাধ্যমে অর্জন করা সম্ভব হয়। আর তাই নিয়মিত পরীক্ষা দিলে স্মৃতিশক্তি দীর্ঘ সময়ের জন্য মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটির মনোবিদ ড. ক্যাথরিন রওসন জানিয়েছেন, পরীক্ষার অনুশীলনের ফলে স্মৃতি হাতড়ে কোন কিছু খুঁজে বের করার মানসিকতা তৈরী হয় যা পরবর্তীতে আবারো মনে করা সম্ভব হয়।

বিদ্যুৎ উৎপাদিত হবে কৃত্রিম পাতা দিয়ে

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গবেষকরা বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম পাতা তৈরি করছেন যা বাস্তবভিত্তিক কাজে লাগবে। বড় ধরনের পোকার কার্ড আকারের এই কৃত্রিম পাতাকেই বলা হচ্ছে পরবর্তী প্রজন্মের সৌরকোষ। ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (এমআইটি)-এর গবেষকদের উদ্ভাবিত এই কৃত্রিম পাতা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মতোই কাজ করে। এই প্রক্রিয়ায় সূর্যশক্তিকে কাজে লাগিয়ে শক্তি উৎপাদন করা যায়। গবেষক ড্যানিয়েল নোসেরা জানিয়েছেন, কম খরচে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য উদ্ভাবন, যা গরীব এবং উন্নয়নশীল দেশগুলোর জন্য কাজে লাগবে।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

যেলা সম্মেলন

জনগণ নয়, আল্লাহ্ই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বগুড়া ২৮ মার্চ সোমবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বগুড়া যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের ঐতিহ্যবাহী আলতাফুন নেসা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত বগুড়া যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের সিনিয়র **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সযত্নে নিজ হাতে সৃষ্টি করে তাঁর ইবাদতের জন্য দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার সার্বভৌমত্ব তথা তাওহীদকে বিশ্বাসে ও কর্মে ধারণ করে মানুষ দুনিয়াকে সুন্দরভাবে আবাদ করবে এটাই ছিল মানবতার বড় দায়িত্ব। কিন্তু কালের পরিক্রমায় মানুষ মানুষকে সার্বভৌমত্বের আসনে বসিয়েছে। এভাবে শাসন ও বিচার ব্যবস্থার সর্বত্র বৃটিশ বিধান ও নিজেদের কল্পিত বিধান সমূহ চালু রাখার ফলে সমাজে দিন দিন অশান্তি বৃদ্ধি পাচ্ছে। মুহতারাম আমীরে জামা'আত সকলকে আল্লাহ্র একত্ববাদকে বুঝার এবং নিজেদের সার্বিক জীবন আল্লাহ্র বিধান অনুযায়ী পরিচালনার উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, একই প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র শিক্ষক মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, রাজশাহী মহানগর 'আন্দোলন'-এর সাবেক সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক ইমামুদ্দীন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ তাওহীদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মুহাম্মাদ আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ। সম্মেলনে ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর প্রধান মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম।

ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের নিষেধ প্রত্যেক মুসলমানের আবশ্যিক দায়িত্ব

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

মণিরামপুর, যশোর ৩১ মার্চ বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' যশোর যেলার যৌথ উদ্যোগে মণিরামপুর থানাধীন চণ্ডিপুর হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত যশোর যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন যে, মতবাদ বিক্ষুব্ধ এই পৃথিবীতে মুসলমানকে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে দু'টি দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। সে দু'টি দায়িত্ব হ'ল ন্যায়ের আদেশ দেওয়া ও অন্যায়ের নিষেধ করা। অথচ শ্রেষ্ঠত্বের মালা গলায় পরে মুসলমানরা আজ আল্লাহ প্রেরিত শ্রেষ্ঠ বিধান ছেড়ে দিয়ে নিজেদের রচিত মতবাদ তথা Manmade Law সমূহের মাধ্যমে নব্য জাহেলিয়াতে নিমজ্জিত। ফলে মানুষের সার্বিক জীবন আজ আগ্নেয়গিরির লাভার মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। মুসলমানরা যেন আল্লাহ্র দেয়া ওয়াদার চিরন্তন বাস্তবতার দিকেই এগিয়ে চলেছে। যেমনটি নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন যে, 'যদি তোমরা অন্যায়ের নিষেধ না কর, এবং হক্বের দাওয়াত না দাও, তাহ'লে অন্য জাতি তোমাদের ঘাড়ে চেপে বসবে অথবা তোমাদের উপর আসবে ব্যাপক গযব'। তিনি সকলকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের পতাকাতলে সমবেত হয়ে জামা'আতবদ্ধ ভাবে সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে নিষেধ-এর গুরু দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম এবং প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুত্তালিব বিন ঈমান, নামোপাড়া আলিম মাদরাসা রাজশাহীর অধ্যক্ষ মাওলানা আবু বকর ছিদ্দীক প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর সাবেক কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। মুহতারাম আমীরে জামা'আত এখানে রাত্রি যাপন করেন এবং বাদ ফজর ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডীপুর জামে মসজিদে সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে উপদেশমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। অতঃপর তিনি মুছল্লীদের সাথে নিয়ে মাত্র ২১ দিন আগে গাড়ী এক্সিডেন্টে মৃত্যুবরণকারী জনাব মূসা সানা (৯০)-এর কবর যেয়ারত করেন ও তার উত্তরাধিকারীদের সান্ত্বনা প্রদান করেন। উল্লেখ্য যে, গত ১০ মার্চ তারিখে তপশীডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের পার্শ্ববর্তী কৃষ্ণবাটি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে স্থানীয় আহলেহাদীছ মুছল্লীদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ইসলামী জালসায় আসার পথে তিনি মসজিদের সন্নিকটে ট্রাক চাপায় মর্মান্তিকভাবে নিহত হন।

অতঃপর তিনি স্বীয় সফর সঙ্গীদের নিয়ে যশোর অভিমুখে রওয়ানা হন এবং ইতিপূর্বে ১৯৯৩ সালে তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত যশোর-বেনাপোল মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী তপশীডাঙ্গা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা দেন। ছালাত শেষে তাঁর সাথী কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ সমবেত মুছল্লীদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্তভাবে বক্তব্য রাখেন। অতঃপর তিনি সফর সঙ্গীদের নিয়ে ঝিনাইদহ যেলা সম্মেলনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন।

কবরের তিনটি প্রশ্নের ব্যাপারে সচেতন হৌন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

ঝিনাইদহ ১ এপ্রিল শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে শহরের উজির আলী হাইস্কুল ময়দানে অনুষ্ঠিত ২য় বার্ষিক ইসলামী সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় নামিয়ে দিয়েছিলেন একটি গাইড বুক দিয়ে। কিন্তু মানুষের প্রকাশ্য শত্রু শয়তানের ধোঁকায় পড়ে মানুষ বারংবার বিপথে পা বাড়াচ্ছে। মায়ের গর্ভ হ'তে দুনিয়ার আলো-বাতাসে এসে দুনিয়ার মোহজালে আটকা পড়ে কবরের চিরন্তন তিনটি প্রশ্নের ব্যাপারে মানুষ একেবারে গাফেল হয়ে পড়েছে। অথচ তাকে কবরের পরীক্ষায় পাশ করেই তবে জান্নাতের সার্টিফিকেট হাছিল করতে হবে। অন্যথায় চিরস্থায়ী জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হ'তে হবে। তিনি সকলকে আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধান অনুযায়ী জীবন যাপনের মাধ্যমে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি হাছিলের উদাত্ত আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ড. এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ।

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধানের নাম

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

বাগেরহাট ৬ এপ্রিল বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বাগেরহাট যেলার যৌথ উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী কালদিয়া মাদরাসা ময়দানে অনুষ্ঠিত যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, পবিত্র কুরআন পরিপূর্ণতা লাভ করেছে সত্য, ন্যায়পরায়ণতা দিয়ে এবং মানব জীবনের থিউরিটিক্যাল ও প্র্যাকটিক্যাল সর্বপ্রকারের প্রেসক্রিপশন দিয়ে। ইসলাম Complete code of life-এর নাম। ইহুদী-নাছারাদের ন্যায় নিজেদের স্বার্থে কুরআনী বিধানকে পরিবর্তন বা পরিমার্জনের কোন সুযোগ নেই। হক ও বাতিলের মধ্যে আপোষনামার ছুরি চালিয়ে ইসলামের শত্রুরা হককে যবেহ করতে চায়। যা সূর্যের কিরণকে ঠেকাতে জোনাকির বৃথা আস্ফালন বৈ কিছুই নয়। তিনি সবাইকে সকল প্রকার সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ওঠে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশনা মেনে চলার আহ্বান জানান।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সরদার আশরাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির, প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী রহমানী, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা যুবায়ের আলী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক।

উল্লেখ্য যে, উক্ত সম্মেলনের পূর্ব ঘোষিত স্থান ছিল বাগেরহাট শহরের 'স্বাধীনতা স্কয়ার'। যেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে লিখিত অনুমতিও পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সম্মেলনের দিন বিকাল ৫-টায় যেলা প্রশাসক স্থানীয় মুছল্লীদের আপত্তির অজুহাত দেখিয়ে অনুমতি বাতিল করে পুনরায় লিখিত পত্র দেন। ফলে শহরের নিকটবর্তী 'আন্দোলন'-এর নিজস্ব প্রতিষ্ঠান আমীরে জামা'আতের উদ্যোগে ১৯৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত কালদিয়া মারকাযে তাৎক্ষণিকভাবে খোলা আকাশের নীচে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রশাসনের এই বৈরী আচরণে বাগেরহাট যেলার আহলেহাদীছ জনগণ দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন।

সার্বিক জীবনে আল্লাহ্র বিধান মেনে চলুন!

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

খুলনা ৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' খুলনা যেলা সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে নগরীর প্রাণকেন্দ্র হাদীছ পার্কে অনুষ্ঠিত খুলনা যেলা সম্মেলনে প্রদত্ত প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণ বিধান হচ্ছে আল্লাহ প্রেরিত বিধান, যা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে সংকলিত রয়েছে। এ বিধানের আলোকে সার্বিক জীবন গড়ে তোলা প্রত্যেক মানুষের জন্য একান্তভাবে আবশ্যক। এ বিধানের পূর্ণাঙ্গ অনুশীলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে শান্তির ফল্গুধারা বয়ে যাবে। আর এর বিরুদ্ধাচরণের ফলে নেমে আসবে এলাহী গযব। বাংলাদেশের শাসকগণের তাই এলাহী বিধানের বিপরীতে কোন বিধান প্রবর্তন ও চালু করা উচিত হবে না। নইলে আল্লাহ্র রোষানলে পড়ে যে কোন সময় এদেশ কঠিন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে পারে। তিনি আরো বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন দুনিয়ার মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত করার আন্দোলন। এটি কোন মতবাদ নয়, বরং এটি একটি পথের নাম, একটি দাওয়াতের নাম। এ পথ হ'ল জান্নাতের পথ। এ দাওয়াত হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দাওয়াত।

যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য, অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, ড. এ এস এম আযীযুল্লাহ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মুযাফফর বিন মুহসিন। সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল ও সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, পিরোজপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন, জুনারী দাখিল মাদরাসা তেরখাদার সহ-সুপার মাওলানা আব্দুর রহীম প্রমুখ। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির।

মাওলানা আব্দুর রঊফের শয্যা পাশে আমীরে জামা'আত :

খুলনা যেলা সম্মেলন শেষে পরদিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত তাঁর সফরসঙ্গীদের নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ প্রবীণ আলেম মাওলানা আব্দুর রঊফকে দেখতে শহরের খালিশপুরস্থ তাঁর বাসভবনে গমন করেন। তিনি কিছু সময় তার পাশে থাকেন ও তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজ-খবর নেন। তিনি তাঁর জন্য খালেছ দো'আ করেন। যাওয়ার পথে তিনি তাঁর উদ্যোগে ১৯৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত শহরের গোয়ালখালি আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সামনে কিছুক্ষণ যাত্রাবিরতি করেন। অতঃপর মুছল্লীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে খালিশপুর গমন করেন। এ সময়ে আমীরে জামা'আতের সফরসঙ্গী ছাড়াও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব গোলাম মোক্তাদির ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক খালিশপুরের স্থায়ী নিবাসী কাযী হারুনুর রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গায় জুম'আর ছালাত আদায় :

মাওলানা আব্দুর রউফকে দেখার পর আমীরে জামা'আত মেহেরপুর যেলা সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে খুলনা ত্যাগ করেন। পথিমধ্যে চুয়াডাঙ্গা যেলার দামুড়হুদা থানার অদূরে অবস্থিত বায়তুল মামূর জামে মসজিদের ইমাম জনাব ক্বামারুযযামানের আমন্ত্রণে সেখানে গমন করেন এবং জুম'আর ছালাত আদায় করেন। খুৎবায় তিনি সূরা আছরের আলোকে আহলেহাদীছ আন্দোলনের নির্ভেজাল দাওয়াতের কথা মুছল্লীদের নিকট তুলে ধরেন। ছালাত শেষে আমীরে জামা'আত উপস্থিত মুছল্লীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। অতঃপর মেহেরপুরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। এ সময়ে ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকুব হোসাইন দফতর সম্পাদক রবীউল ইসলাম এবং চুয়াডাঙ্গা যেলা 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/২৮১): আদম ও হাওয়া (আঃ)-কে যখন পৃথিবীতে পাঠানো হয় তখন তারা কোন স্থানে অবতরণ করেন?

-শহীদুল্লাহ
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : তাঁদেরকে কোথায় অবতরণ করানো হয়েছিল এ মর্মে কোন স্পষ্ট ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। প্রচলিত বর্ণনা সমূহের ছহীহ কোন ভিত্তি নেই।

প্রশ্ন (২/২৮২): ফরয ছালাতের শেষ বৈঠকে আত্তাহিইয়াতু, দরূদ না পড়ে কেউ যদি ঘুমিয়ে যায়, তাহ'লে তার ছালাত হবে কি?

-ফয়েয
ধামতী, মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তর : এ অবস্থায় সালাম ফিরিয়ে ছালাত সমাপ্ত করলে তার ছালাত হয়ে যাবে। কারণ ছালাত থেকে বের হওয়ার জন্য সালাম ফিরানো আবশ্যক। আর সালামও যদি না ফিরায় তাহলে তার ছালাত হবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাতের তাকবীর বললে সবকিছু হারাম হয়, আর সালাম ফিরালে সবকিছু হালাল হয় *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১২)*। তাশাহহুদ ও দরূদ ব্যতীত ছালাত হলেও এগুলি পড়া যরূরী। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এগুলো নিয়মিত পড়তেন।

প্রশ্ন (৩/২৮৩) : অনেকে পবিত্র কুরআনের কসম করে থাকে। এটা কি শরী'আত সম্মত? কার নামে কসম করতে হবে?

-নাঈম
চাঁনগাও, নরসিংদী।

উত্তর : আল্লাহর নামেই কসম করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪০৭; আবুদাঊদ হা/৩২৪৭-৫১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করে সে শিরক করে *(আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৪১৯)*। তবে পবিত্র কুরআনেরও কসম করা যায়। কেননা কুরআন আল্লাহ্র কালাম *(বুখারী হা/৭৪১৭-এর পূর্বের আলোচনা দ্রঃ)*। আল্লাহ্র ছিফাত সমূহ দ্বারা কসম করা জায়েয। যেমন আল্লাহ্র ইযযত ও কুদরতের কসম, তাঁর কালামের কসম ইত্যাদি *(বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : বায়হাক্বী সুনানুল কুবরা ১০/৪১ পৃঃ, সনদ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১১৬৭)*।

প্রশ্ন (৪/২৮৪) : পবিত্র কুরআনে সিজদা কয়টি? এ সিজদা কিভাবে করতে হবে?

- আবু তালিব
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআনে ১৫ স্থানে সিজদা আছে। সূরা হজ্জে দুই স্থানে সিজদা রয়েছে। ছালাতের সিজদার মত তাকবীর দিয়ে সিজদা করবে এবং দো'আ পড়ার পর তাকবীর দিয়ে মাথা উঠাবে *(মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক হা/৫৯৩০; বায়হাক্বী ২/৩২৫; সনদ ছহীহ, আলবানী, তামামুল মিন্নাহ পৃঃ ২৬৯)*।

প্রশ্ন (৫/২৮৫) : ফরয ছালাতের একামত হলে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জাম'আতে শরীক হতে হয়। কিন্তু ছেড়ে দেয়া সুন্নাত পড়তে হবে কি?

-সজিব
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : পরে পড়ে নিতে হবে *(মুওয়াত্ত্বা মালেক, সনদ মুরসাল ছহীহ, মিশকাত হা/৬৮৭)*। তবে পূর্বের ছালাতের জন্য সে পূর্ণ নেকী পাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬)*। ফজরের সুন্নাত ক্বাযা হ'লে জামা'আতে ছালাতের পরেই তা পড়া যাবে *(আবুদাঊদ হা/১২৬৭; তিরমিযী হা/৪২২; ইবনে মাজাহ হা/১১৫৪; মিশকাত হা/১০৪৪)*।

প্রশ্ন (৬/২৮৬) : ছিয়াম পালনকারী মহিলার সূর্য ডোবার পূর্ব মুহূর্তে যদি ঋতু আসে, তাহ'লে তার ছিয়াম নষ্ট হবে কি? নষ্ট হ'লে ঐ ছিয়ামের ক্বাযা করতে হবে কি?

-তিন্নী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তর : উক্ত সময়ে ঋতু শুরু হ'লে ছিয়াম বাতিল হবে এবং পরবর্তীতে তাকে ঐ ছিয়াম পালন করতে হবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, ঋতু অবস্থায় আমাদেরকে ছিয়াম ক্বাযা করার এবং ছালাত ছেড়ে দেয়ার আদেশ দেওয়া হ'ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩২, 'ক্বাযা ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। তবে ছুটে যাওয়া ছিয়ামের সে পূর্ণ নেকী পাবে। কারণ সে নেকীর আশায় ছিয়াম শুরু করেছিল *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায় ৫ অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৭/২৮৭) : ছালাতে দাঁড়ানোর সময় মুছল্লীর দুই পায়ের মাঝে কতটুকু ফাঁক থাকবে?

- আব্দুল খাবীর
কাঞ্চন, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তর : কাতারে দাঁড়িয়ে শরীরের স্বাভাবিক ভারসাম্য অনুযায়ী পায়ে পা ও কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াতে যতটুকু ফাঁক রাখার প্রয়োজন হয়, ততটুকু ফাঁক রাখবে *(বুখারী হা/৭২৫; আবুদাঊদ হা/৬৬২)*। তাছাড়া দুই পায়ের মাঝে জুতা জোড়া রাখা যায় এতটুকু ফাঁকা রাখার কথা হাদীছে এসেছে *(আবুদাঊদ হা/৬৫৪-৫৫, সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (৮/২৮৮) : মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে ও বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিতে হবে মর্মে কোন ছহীহ দলীল আছে কি?

-দিদার বখশ
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : মসজিদে প্রবেশ করার সময় ডান পা আগে এবং বের হওয়ার সময় বাম পা আগে দিতে হবে *(বায়হাক্বী ২/৪৪২; হাকেম ১/২১৮; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৪৭৮, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৮৯): মুসলমানের পোষাক কেমন হবে? পুরুষ ব্যক্তি লাল পোষাক পরতে পারে কি?

-সোহেল হাজারী
মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : পোষাকের জন্য চারটি মূলনীতি রয়েছে। যথা- (১) পোষাক পরিধানের উদ্দেশ্য হবে দেহকে ভালভাবে ঢেকে রাখা, যাতে লজ্জাস্থান সমূহ অন্যের চোখে প্রকট হয়ে না ওঠে (২) ভিতরে-বাইরে তাক্বওয়াশীল হওয়া (৩) অমুসলিমদের সাদৃশ্য না হওয়া (৪) অপচয় ও অহংকার প্রকাশ না পাওয়া। এজন্য পুরুষ যেন সোনা ও রেশম পরিধান না করে এবং টাখনুর নীচে কাপড় না রাখে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৩৬-৩৭)*। হজ্জের ইহরাম ব্যতীত অন্য সময় লাল রংয়ের পোষাক পরা যাবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৭৮৩ 'ফাযায়েল ও শামায়েল' অধ্যায় ২ অনুচ্ছেদ)*। তবে সাদা পোষাক হ'ল সবচেয়ে পসন্দনীয় পোষাক। সাদা পোষাক পরতে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) নির্দেশ দিয়েছেন *(ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৩৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১০/২৯০) : জনৈক আলেম বলেন, তিনটি নিষিদ্ধ সময়ে ক্বাযা ছালাত আদায় করা যাবে। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক? কোন্ কোন্ ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ?

- সোহেল রানা
মনিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : সূর্যোদয়, মধ্যাহ্ন ও সূর্যাস্তকালে ছালাত শুরু করা সিদ্ধ নয়। অনুরূপভাবে আছরের ছালাতের পর হ'তে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এবং ফজরের ছালাতের পর হ'তে সূর্যোদয় পর্যন্ত কোন ছালাত নেই। তবে এ সময় ক্বাযা ছালাত আদায় করা জায়েয আছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত, হা/১০৩৯-৪১, ৪৩; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৪৫)*। তাছাড়া যে কোন সময়ে ক্বাযা ছালাত আদায় করা যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছালাত থেকে ঘুমিয়ে গেলে বা ভুলে গেলে যখন স্মরণ হবে তখনই ছালাত আদায় করবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪; বুখারী, মিশকাত হা/৬০১, ৬০২)*। অনুরূপ তাহইয়াতুল মাসজিদ যেকোন সময় পড়া যাবে *(বুখারী হা/৪৪৪; মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্ন (১১/২৯১) : মসজিদের ইমাম বলেন, তাসবীহ দানা দ্বারা তাসবীহ গণনা করলে কোন নেকী হবে না বরং গোনাহ হবে। সুন্নাত হল আঙ্গুলে তাসবীহ গণনা করা। এ বিষয়ে জানতে চাই।

-আব্দুল আযীয
সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আঙ্গুলে তাসবীহ গণনার জন্য আদেশ করেছেন। কেননা ক্বিয়ামতের দিন আঙ্গুলগুলো জিজ্ঞাসিত হবে এবং তারা কথা বলবে *(আবুদাঊদ হা/১৫০১; তিরমিযী হা/৩৪৮৬, সনদ ছহীহ; মিশকাত হা/২৩১৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ডান হাতে তাসবীহ গননা করতে দেখেছি *(বায়হাক্বী ২/১৮৭; আবুদাঊদ হা/১৫০২)*। উল্লেখ্য, দানা বা কংকর দ্বারা তাসবীহ গণনা করার বর্ণনা যঈফ *(আবুদাঊদ হা/১৫০০; তিরমিযী হা/৩৫৬৮; মিশকাত হা/২৩১১; সিলসিলা যঈফাহ হা/৮৩)*।

প্রশ্ন (১২/২৯২) : অজ্ঞাত কোন মহিলার লাশ নদীতে বা সীমান্ত এলাকায় পাওয়া গেলে তার জানাযা পড়া যাবে কি?

- আখতার
কানসাট, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : মুসলিম প্রমাণিত না হ'লে তার জানাযা করা যাবে না। এমন লাশকে বিনা জানাযায় স্বাভাবিকভাবে দাফন করতে হবে। হযরত আলী তাঁর পিতা আবু তালেবকে তার মৃত্যুর পর রাসূল (ছাঃ)-এর হুকুমে এভাবেই দাফন করেছিলেন *(আবুদাঊদ হা/৩২১৪)*।

প্রশ্ন (১৩/২৯৩) : জিন ও মানুষের জান কবয করেন মালাকুল মউত। কিন্তু অন্যান্য জীব জন্তুর জান কে কবয করেন?

-নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : অনুরূপ একটি প্রশ্নের জওয়াবে ইমাম মালেক (রহঃ) প্রশ্নকারীকে জিজ্ঞেস করেন, তাদের কি প্রাণ আছে? প্রশ্নকারী বলেন, আছে। তখন ইমাম মালেক (রহঃ) বলেন, মালাকুল মউত তাদের জান কবয করে। কেননা আল্লাহ বলেন, اللهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا 'আল্লাহ জীবসমূহের প্রাণ হরণ করেন তাদের মৃত্যুর সময়' *(যুমার ৩৯/৪২; কুরতুবী, তাফসীর সূরা সাজদাহ ১১)*। অন্য আয়াতে এর ব্যাখ্যা এসেছে, تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا 'তার প্রাণ হরণ করে আমাদের প্রেরিত দূতগণ' *(আন'আম ৬/৬১)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, ফেরেশতাগণের মধ্যে মালাকুল মউতের বহু সাহায্যকারী (أعوان) রয়েছে। যারা দেহ থেকে রূহ বের করে আনে। অতঃপর হলকূমের কাছে এলে মালাকুল মউত তা কবয করে *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা আন'আম ৬২)*। আল্লাহ বলেন, হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, মালাকুল মউত তোমাদের জান কবয করে থাকে। যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। অতঃপর তোমরা সকলে তোমাদের পালনকর্তার নিকট ফিরে আসবে' *(সাজদাহ ৩২/১১)*। এখানে সেরা সৃষ্টি হিসাবে 'মানুষ'কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। যার মধ্যে অন্য সকল সৃষ্টি শামিল রয়েছে। 'মালাকুল মউত' আযরাঈল একক ফেরেশতা হ'লেও তার

সাহায্যকারীদের প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ বলেন, فَكَيْـــفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ– 'তাদের অবস্থা কেমন হবে যখন ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করবে...' *(মুহাম্মাদ ৪৭/২৭)*। আল্লাহ ফেরেশতাদের অসীম ক্ষমতা দান করেছেন, যা মানুষের ক্ষমতার সঙ্গে তুলনীয় নয়। তারা আল্লাহ্র কখনো অবাধ্যতা করেন না এবং সর্বদা তাঁর হুকুম পালনে প্রস্তুত থাকেন *(তাহরীম ৬৬/৬)*। মালাকুল মউত অন্যান্য প্রাণীর জান কবয করেন না বলে যে বর্ণনা রয়েছে তা মওযূ বা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৬৯৩)*।

প্রশ্ন (১৪/২৯৪) : ছহীহ বুখারীর হাদীছে রয়েছে যে, মৃতকে দাফন করে যখন লোকেরা চলে আসে তখন ঐ ব্যক্তি মানুষের পায়ের জুতার শব্দ শুনতে পায়। কিন্তু আল্লাহ বলেন, তুমি কবরবাসীকে কিছু শুনাতে পার না (ফাতির ২২)। এর সমাধান কী?

-এমদাদ
সিংগাপুর।

উত্তর : এর সমাধান সুরা ফাতিরে ঐ আয়াতের প্রথমাংশে রয়েছে : আল্লাহ তা'আলা বলেন: إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ 'আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে শ্রবণ করান। কিন্তু তুমি কবরবাসীকে শুনাতে সক্ষম নও *(ফাতির ২২)*। অতএব হাদীছে কবরস্থ ব্যক্তির জুতার আওয়ায শোনার যে বক্তব্য এসেছে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২৬)*, তা শুনানোর এখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর এবং তিনি যখন চান তখন শুনান। অতএব অন্য কেউ তার ইচ্ছা ব্যতীত যেমন শুনাতে পারবে না, তেমনি তিনি কখন শুনাবেন সেটিও কেউ জানে না ।

প্রশ্ন (১৫/২৯৫) : ছালাতের মধ্যে সূরা বাক্বারাহ শেষে আমরা 'আমীন' বলে থাকি। এর দলীল জানতে চাই।

-জয়নাল মাষ্টার
রাজপাট, বাগেরহাট।

উত্তর : সূরা বাক্বারাহ শেষে 'আমীন' বলার পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে ছাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে মওকূফ সূত্রে একটি বর্ণনা পাওয়া যায় *(তাফসীর ইবনে কাছীর, ২৮৬ আয়াত)*। এর বর্ণনাকারী আবু ইসহাক্ব ও ছাহাবী মু'আযের মধ্যে একজন অজ্ঞাত ব্যক্তি থাকায় সনদ মুনক্বাতি' অর্থাৎ বিচ্ছিন্ন হওয়ায় 'যঈফ' *(ঐ, মুহাক্কিক্ব)*।

প্রশ্ন (১৬/২৯৬) : অনেকে বলেন, পুরাতন কবরে লাশ দাফন করলে কবরের আযাব হবে না এবং তার কোন হিসাব-নিকাশও হবে না। কারণ পূর্বে যে ঐ কবরে ছিল সে তো হিসাব দিয়েই দিয়েছে। উক্ত কথাটি কি ঠিক?

- সোহেল হাজারী
তালতলী, মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। কেননা এক কবরে একাধিক ব্যক্তির দাফন হ'তে পারে। তাছাড়া প্রত্যেকের হিসাব পৃথক হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, 'প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় কৃতকর্মের জন্য দায়ী হবে। কেউ কারু বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমরা সবাই তোমাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন ঐসব বিষয়ে যেসব বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে' *(আন'আম ১৬৪)*।

প্রশ্ন (১৭/২৯৭) : জনৈক হিন্দু ব্যক্তির আমার কাছে কিছু টাকা পাওনা ছিল। কিন্তু এখন তাকে আর পাওয়া যাচ্ছে না এবং তার ঠিকানাও জানা নেই। এ মুহূর্তে আমার করণীয় কী।

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী মীরবাড়ী, কুমিল্লা।

উত্তর : মুসলিম বা অমুসলিম হোই হৌক পাওনাদারকে সাধ্যমত খুঁজে বের করতে হবে। এজন্য আধুনিক মিডিয়া সমূহ ব্যবহার করতে হবে। ছাহাবী উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) ১০০ স্বর্ণমুদ্রা ভর্তি একটি থলি পেয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে থলির মালিকের সন্ধানের জন্য পরপর তিনবছর চারদিকে প্রচার করতে বলেন। অতঃপর না পাওয়ায় তাঁকে উক্ত মাল ব্যবহার করার অনুমতি দেন *(বুখারী হা/২৪২৬)*। যায়েদ বিন খালেদ আল-জুহানী বর্ণিত হাদীছে এসেছে যে, তুমি এক বছর প্রচার কর। না পেলে তুমি তা থেকে খরচ কর। অতঃপর যদি মালিক এসে যায়, তাহ'লে তাকে তা ফেরৎ দাও *(বুখারী হা/২৪৩৬)*। উক্ত মাল যদি ছাগল ইত্যাদি নষ্টযোগ্য হয়, তবে তা নিজ ব্যবহারে নেওয়া যাবে। তবে নষ্ট হওয়ার পূর্বে মালিক এসে গেলে তাকে তা ফেরৎ দিতে হবে *(বুখারী হা/২৪২৭)*। ইবনু মাসঊদ ও ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, এক বছর প্রচার করার পর ঐ মাল ছাদাক্বা করে দিবে *(ফাৎহুল বারী ৯/৩৪০ 'তালাক' অধ্যায়)*। ওমর (রাঃ) থেকে চার প্রকার বর্ণনা এসেছে, (১) তিন বছর প্রচার করবে (২) ১ বছর (৩) ৩ মাস (৪) ৩ দিন। ইবনুল মুনযির বলেন, এর দ্বারা তিনি উক্ত মালের উচ্চমূল্য ও নিম্ন মূল্যের তারতম্য বুঝিয়েছেন' *(বুখারী হা/২৪২৬-এর ব্যাখ্যা। ফৎহুলবারী ৫/৯৬)*। উপরোক্ত আলোচনায় বুঝা যায় যে, মালের মূল্য ও গুরুত্ব বুঝে সাধ্যমত প্রচার শেষে তা ব্যবহার করা যাবে। অথবা ছাদাক্বা করে দিবে। এরপরেও মালিক পাওয়া গেলে এবং তিনি দাবী না ছাড়লে তাকে তার মাল ফেরত দিতে হবে।

প্রশ্ন (১৮/২৯৮) : ঘর হতে বের হওয়ার সময় দরজা বা চৌকাঠে আঘাত লাগলে বলা হয় এ যাত্রা শুভ হবে না। উক্ত ধারণা কি সঠিক?

-সুরাইয়া
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : এগুলো কুসংস্কার মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ছোঁয়াচে রোগ বলতে কিছু নেই, কোন কিছুতে অশুভ নেই, পেঁচার মধ্যে কুলক্ষণ নেই এবং ছফর মাসেও কোন অশুভ নেই। তবে কুষ্ঠরোগী হতে পলায়ন কর যেমন বাঘ হতে পলায়ন কর'। একথা শুনে জনৈক বেদুঈন বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) তাহ'লে পালের মধ্যে একটা চর্মরোগী উট আসলে বাকীগুলি চর্মরোগী হয় কেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তাহ'লে প্রথম উটটিকে চর্মরোগী বানালো কে? *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫৭৭-৭৮ 'চিকিৎসা ও মন্ত্র' অধ্যায় 'শুভ ও অশুভ লক্ষণ' অনুচ্ছেদ-১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, অশুভ লক্ষণ গ্রহণ করা শিরকী কাজ। তিনি বাক্যটি তিনবার বলেন। আর আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে অশুভ লক্ষণের ধারণার উদ্রেক হয় না। কিন্তু আল্লাহ্র উপর দৃঢ় আস্থা থাকলে আল্লাহ তা দূরীভূত করে দেন' *(আবু দাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৮৪)*। অতএব শুভ-অশুভ লক্ষণের উপর নয়, বরং সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করতে হবে।

প্রশ্ন (১৯/২৯৯) : অনেককে ফজরের ছালাতের পর 'হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম' ও 'হুওয়ার রাহমানুর রাহীম' ১০০ বার করে পাঠ করতে দেখা যায়। এ সম্পর্কে শরী'আতের দলীল জানতে চাই।

- জাফর
কোলাপাড়া, বগুড়া।

উত্তর : উল্লেখিত বাক্যাংশ দু'টি যথাক্রমে সূরা আলে ইমরান ২ ও বাক্বারাহ ১৬৩নং আয়াতের অংশ। যা নির্দিষ্টভাবে ফজর ছালাতের পর ১০০ বার করে পাঠ করার ব্যাপারে কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

প্রশ্নঃ (২০/৩০০) : খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ)-কে বিষ পান করতে দিলে তিনি 'বিসমিল্লাহ' বলে পান করেন। ফলে কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। উক্ত ঘটনাটি কি সঠিক?

-মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী
রসূলপুর মাদরাসা, নরসিংদী।

উত্তর : ঘটনাটি বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে *(আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৬/৩৫১ পৃঃ, ১২ হিজরীর বর্ণনা, খালিদ (রাঃ)- কে ইরাক প্রেরণ শীর্ষক আলোচনা দ্রঃ; তারীখে ত্বাবারী ২/৩১৭; তারীখে দেমাশক ৩৭/৩৬৫ প্রভৃতি)*। ঘটনাটি খুবই ঈমান বর্ধক এবং তা নিম্নরূপ : ইরাকের সমৃদ্ধ নগরী 'হীরা' অবরোধকালে সেখানকার আরব খৃষ্টান নেতা ইবনু বাক্বীলাহ সেনাপতি খালেদের নিকট নীত হন। খালেদ তার থলির মধ্যে একটা বিশেষ কৌটা পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কেন? সে বলল, পরাজয়ের আশংকা দেখা দিলে ধূত হবার চাইতে আত্মহত্যা করাকেই আমি অধিক পসন্দ করি'। তখন খালেদ সেটি হাতে নিয়ে বললেন, নির্ধারিত সময়ের পূর্বে কোন প্রাণীই মরতে পারে না। অতঃপর তিনি বলেন, বিসমিল্লাহি খায়রিল আসমা, রব্বিল আরযে ওয়াসসামা, আল্লাযী না ইযাযু'রু মা'আ ইসমিহী দা-উন, আর রহমা-নুর রহীম'। একথা শুনে অন্য সেনাপতিরা তাঁকে বিরত রাখতে দ্রুত এগিয়ে আসেন। কিন্তু তার আগেই তিনি তা গিলে ফেলেন।

এ দৃশ্য দেখে খৃষ্টান নেতা ইবনু বাক্বীলাহ বলে উঠলেন, হে আরবগণ! তোমাদের মধ্যে একজন বেঁচে থাকলেও তোমরাই বিজয়ী হবে। অতঃপর তিনি হীরাবাসীদের উদ্দেশ্যে বললেন, আজকের চাইতে স্পষ্ট সৌভাগ্যের দিন আমি দেখিনি। অতঃপর তিনি তাদেরকে আহ্বান করলেন এবং তারা এসে খালেদের নিকট সন্ধি প্রার্থনা করল। এভাবে বিনা যুদ্ধে জয় হ'ল *(আল- বিদায়াহ... ৬/৩৫১)*। এ ঘটনা সত্য হ'লে এর মাধ্যমে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুর নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই, আল্লাহ্র হুকুম ব্যতীত। যে ভাবে ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্য আগুন ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল। যদিও সেটা সকলের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় প্রযোজ্য নয়। কেননা আল্লাহ বলেন, তুমি আল্লাহ্র নিয়মের কোন ব্যতিক্রম পাবে না *(ফাত্বির ৪৩)*। 'তিনি যেটা ইচ্ছা করেন, কেবল সেটাই হয়ে থাকে' *(বুরূজ ১৬)*। তাঁর ইচ্ছার বাইরে কিছুই করার ক্ষমতা মানুষের নেই *(দাহর ৩০)*।

প্রশ্ন (২১/৩০১) : অনেক মসজিদে লেখা দেখা যায়, লাল বাতি জ্বললে কেউ সুন্নাতের নিয়ত করবেন না। এভাবে লেখা কি শরী'আত সম্মত?

-সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : মসজিদে উক্ত পদ্ধতি চালু করা ঠিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তি যদি ছালাত পড়তে থাকে আর জামা'আতের সময় হয়ে যায় তাহলে সে হাদীছের নির্দেশ মোতাবেক ছালাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৮)*। এতে ঐ ব্যক্তি পূর্ণ ছালাতের নেকী পেয়ে যাবে *(বুখারী, মিশকাত হা/২৩৭৪)*। উক্ত নেকী থেকে বঞ্চিত করে লাল বাতি জ্বালানোর ব্যবস্থা করা উচিত নয়।

প্রশ্ন (২২/৩০২) : পিতা-মাতার অবাধ্য হয়ে বিবাহ করলে বৈধ হবে কি?

-আযীযুল হক
গন্ধর্ববাড়ী, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তর : পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া কাবীরা গোনাহ সমূহের অন্তর্ভুক্ত *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৫০)*। কোন মেয়ে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করলে বিবাহ বাতিল বলে গণ্য হবে *(আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৩১৩০)*। তবে সাবালক ছেলে যদি ঐরূপ বিবাহ করে তাহ'লে তা বাতিল বলে গণ্য হবে না। কিন্তু (নেককার) পিতার অবাধ্যতা করার গোনাহ থেকে সে মুক্ত হবে না।

প্রশ্ন (২৩/৩০৩) : জেনে-শুনে চুরির মাল ক্রয় করা যাবে কি?

-তানভীর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : চুরি করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮)*। জেনে শুনে চুরিকৃত বস্তু ক্রয় করা পাপ কাজের সহযোগিতা করার শামিল। আল্লাহ তা'আলা বলেন, নেকী ও কল্যাণের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর না *(মায়েদাহ ২)*।

প্রশ্ন (২৪/৩০৪) : প্রচলিত আছে কোন মহিলার ২০টি সন্তান হলে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে পুনরায় বিবাহ দিতে হবে। উক্ত ধারণা কি সঠিক?

-আব্দুস সাত্তার
খানপুর, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এটি সামাজিক কুসংস্কার মাত্র।

প্রশ্ন (২৫/৩০৫) : কী কী কারণে কাবীরা গোনাহ হয়।

-আবেজান বেগম
রাজপাট, মোল্লাহাট, বাগেরহাট।

উত্তর : কবীরা গোনাহ অর্থ মহা পাপ। (১) যার শীর্ষে রয়েছে আল্লাহ্র সাথে শিরক করা (২) এরপরে ঐসব গোনাহ যার শাস্তি কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা নির্ধারিত। যেমন হত্যা, চুরি, ব্যভিচার, জুয়া, লটারী, মদ্যপান, মিথ্যা সাক্ষ্য দান ইত্যাদি (৩) যেসব পাপের জন্য আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) অভিসম্পাৎ করেছেন। যেমন ঘুষ খাওয়া ও দেওয়া, হিল্লা বিয়ে করা (৪) যেসব পাপ মানুষকে অধিকতর বড় পাপে প্ররোচিত করে। যেমন নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, সব ধরনের নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনা, মিথ্যা শপথ করা ইত্যাদি (৫) ছগীরা গোনাহ বারবার করা। যেমন কথায় কথায় আল্লাহ্র নামে মিথ্যা কসম খাওয়া, দাড়ি শেভ করা ইত্যাদি। কুরআন-সুন্নাহ্র দৃষ্টিতে কাবীরাহ গোনাহের সংখ্যা ৭ থেকে ৭০০-এর কাছাকাছি। অনুতপ্ত হয়ে তওবা করা ব্যতীত যা মাফ হয় না। নিম্নে বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করা হ'ল :

(১) শিরক করা (২) কবরে সিজদা করা (৩) বিদ'আত করা (৪) গনক এবং জ্যোতিষীর কথা বিশ্বাস করা (৫) আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে যবেহ ও মানত করা (৬) পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (৭) তাক্বদীরকে অবিশ্বাস করা (৮) ছালাত ও যাকাত পরিত্যাগ করা (৯) অকারণে রামাযানের ছিয়াম পালন না করা (১০) সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ্জ না করা (১১) যুলুম করা (১২) হত্যা করা (১৩) আত্মহত্যা করা (১৪) চুরি করা (১৫) ডাকাতি করা (১৬) জাদু করা (১৭) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (১৮) প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয়া (১৯) ওযনে কম দেওয়া (২০) হারাম খাওয়া (২১) খিয়ানত করা (২২) হালালা করা (২৩) বেপর্দা চলা (২৪) যেনা করা (২৫) যিনার অপবাদ দেয়া (২৬) নারীতে-নারীতে ও পুরুষে পুরুষে ব্যভিচার করা (২৭) স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় সঙ্গম করা (২৮) মাসিক অবস্থায় সহবাস করা (২৯) মহিলা পুরুষের বেশ ও পুরুষ মহিলার বেশ ধারণ করা (৩০) পুরুষের রেশমী কাপড় এবং স্বর্ণালংকার পরা (৩১) মদ্য পান করা (৩২) জুয়া খেলা (৩৩) সূদ গ্রহণ, প্রদান এবং তা লেখা ও তার জন্য সাক্ষী হওয়া (৩৪) ঘুষ গ্রহণ ও প্রদান করা (৩৫) মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা কসম খাওয়া (৩৬) অঙ্গিকার ভঙ্গ করা (৩৭) অহংকার করা (৩৮) পুরুষের কাপড় পায়ের গিটের নিচে পরিধান করা (৩৯) অত্মীয়তা ছিন্ন করা (৪০) শরীয়তের খেলাফ কাজ করা (৪১) রিয়া বা লোকদেখানো আমল করা (৪২) গীবত করা (৪৩) তোহমত দেওয়া (৪৪) অভিশাপ দেয়া (৪৫) দুনিয়ার উদ্দেশ্যে দ্বীন শিক্ষা করা (৪৬) দুনিয়ার লোভে দ্বীন বিক্রি করা (৪৭) বিপদাপদে বা কারো মৃত্যুতে মাথায় ও বুকে আঘাত করা ও চিৎকার করে কাঁদা (৪৮) পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা (৪৯) যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা *(ইমাম শামসুদ্দীন যাহাবী প্রণীত আল-কাবায়ের গ্রন্থ অবলম্বনে)*।

প্রশ্ন (২৬/৩০৬) : জনৈক আলেম বলেন, মোযা পরা অবস্থায় প্যান্ট, পায়জামা লুঙ্গী টাখনুর নীচে গেলে কোন সমস্যা নেই। উক্ত দাবী কি সঠিক।

-মনীরুল ইসলাম
মির্জাপুর বাজার, গাযীপুর।

উত্তর : উক্ত দাবী ঠিক নয়। কারণ হাদীছে উক্ত শর্ত উল্লেখ করা হয়নি। এটা শরী'আতের নির্দেশকে অমান্য করার অপকৌশল মাত্র। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের দিকে তাকাবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না; তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি। তন্মধ্যে ১ম ব্যক্তি হ'ল অহংকার বশে টাখনুর নীচে কাপড় পরিধানকারী (২) দান করে খোটা দানকারী এবং (৩) মিথ্যা কসম করে পণ্য বিক্রয় কারী *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৯৫)*। অন্য হাদীছে এসেছে, ঐ ব্যক্তি মাটিতে ধসে যাবে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত হয়রান অবস্থায় চিৎকার দিতে থাকবে *(বুখারী, মিশকাত, হা/৪৩১৩)*। কাজেই পায়ে মোযা থাক বা না থাক কোন অবস্থাতেই টাখনুর নীচে কাপড় পরা যাবে না। অন্যথায় উক্ত হাদীছে বর্ণিত শাস্তির আওতায় পড়ে যাবে।

প্রশ্ন (২৭/৩০৭) : জানাযার ছালাতে দাঁড়ানোর সময় পরস্পরের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে কি? এ সময়ে জুতা পায়ে দিয়ে দাঁড়ানো কি শরী'আত সম্মত?

- ওমর ফারূক
বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : অন্যান্য ছালাতের ন্যায় জানাযার ছালাতেও কাতার হওয়া যরূরী *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৫২, ৫৭, ৫৮)*। উভয় ছালাতে কাতারের হুকুমে কোন পার্থক্যের উল্লেখ নেই। পরিচ্ছন্ন জুতা বা স্যান্ডেল পরে ফরয ছালাত আদায় করা যেমন জায়েয, তেমনিভাবে জানাযার ছালাত আদায় করাও জায়েয *(আবু দাউদ, হা/৩৮৫-৮৭; মিশকাত হা/৫০৩; তিরমিযী হা/৪০০)*।

প্রশ্ন (২৮/৩০৮) : জামা'আতে শরীক হওয়ার সময় যদি দেখা যায় যে, ইমাম সূরা ফাতিহা পড়া শেষ করছেন, তখন ইমামের সাথে আমীন বলবে না আগে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে?

-আব্দুল করীম
আন্ধারিয়া, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : জামা'আতে শরীক হয়ে আগে ইমামের সাথে 'আমীন' বলবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা জামা'আতে এসে ইমামকে যে অবস্থায় পাবে, সে অবস্থায় ইমামের অনুরূপ করবে' *(আবুদাঊদ হা/৫০৬; তিরমিযী হা/৫৯১; মিশকাত হা/১১৪২; ছহীহুল জামে' হা/২৬১)*। তাছাড়া হাদীছে এসেছে যে, ইমামের সাথে 'আমীন' বললে আগের গোনাহ মাফ হয়ে যায় *(বুখারী, মিশকাত হা/৮২৫)*।

প্রশ্ন (২৯/৩০৯) : বর্তমানে প্রায় মসজিদে দেখা যাচ্ছে যে, মক্কা ও মদীনার ছবিসহ বিভিন্ন ছবি দ্বারা নকশা করা কার্পেট দেওয়া হচ্ছে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

-জিহাদ
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর : বিভিন্ন নকশায় সজ্জিত পোষাক, কার্পেট ও কারুকার্য মণ্ডিত মসজিদের দেয়াল ছালাতের মধ্যে মুছল্লীদের একাগ্রতা বিনষ্ট করে। এগুলো থেকে বেঁচে থাকা যরূরী। সেগুলো মক্কা-মদীনার হোক বা অন্য কোন স্থানের বা বস্তুর হোক তা দেখার বিষয় নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭৫৭-৫৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মসজিদকে সাজ-সজ্জা ও জাঁকজমকপূর্ণ করতে নিষেধ করেছেন, যেমন ইহুদী-নাছারারা তাদের পথভ্রষ্টতার যুগে করত। তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের অন্যতম আলামত এই যে, মানুষ মসজিদ নিয়ে গর্ব করবে *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৭১৮-১৯; মির'আত ২/৪২৮)*।

প্রশ্ন (৩০/৩১০) : তিনি সর্বদা কোন না কোন কাজে রত আছেন (রহমান ২৯)। হে মানুষ ও জিন! আমি শীঘ্রই তোমাদের জন্য কর্ম মুক্ত হব (রহমান ৩১)। উক্ত আয়াতদ্বয়ের ব্যাখ্যা জানতে চাই।

-সৈয়দ ফয়েয
ধামতী, কুমিল্লা।

উত্তর : হযরত আবুদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন যে, كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَأْنٍ 'আল্লাহ সর্বদা মহান কর্মে ব্যস্ত' (রহমান ২৯)-এর ব্যাখ্যা এই যে, তিনি সর্বক্ষণ কারু পাপ ক্ষমা করছেন, কারু বিপদ সরিয়ে দিচ্ছেন, কাউকে উচ্চ সম্মানিত করছেন, কাউকে অপদস্থ করছেন' *(ইবনু মাজাহ হা/২০২ সনদ হাসান)*।

ইবনু জুরায়েজ বলেন, এর অর্থ سنقضى لكم সত্বর আমরা তোমাদের ব্যাপারে ফায়ছালা করব। ইমাম বুখারী বলেন, سنحاسبكم لايشغله شئ عن شئ 'সত্বর আমরা তোমাদের হিসাব নেব। কোন কিছুর ব্যস্ততা তাকে অন্য বিষয় হ'তে ভুলিয়ে রাখে না' *(ছহীহ বুখারী, সূরা রহমান-এর তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। এটি গাফেল লোকদের প্রতি আল্লাহ্র কঠোর ধমকি বিশেষ।

প্রশ্ন (৩১/৩১১): অনেক মসজিদের মেহরাবের উপরে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' লেখা দেখা যায়। এর কারণ কী?

- সফিউদ্দীন আহমাদ
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : মসজিদের মেহরাবের উপরে বা অন্য কোন স্থানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', 'আল্লাহ', 'মুহাম্মাদ' বা অন্য কোন আয়াত লেখা শরী'আত সম্মত নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মসজিদে এসব কিছু লেখা বা কোনরূপ বাড়তি সাজ-সজ্জা না থাকায় মোল্লা আলী ক্বারী হানাফী ছাহেবে মিরক্বাত এগুলিকে বিদ'আত' বলেছেন *(মির'আত ২/৪২৮)*।

প্রশ্ন (৩২/৩১২) : ছালাতে সালাম ফিরানোর সময় দুই দিকেই 'ওয়া বারাক্বা-তুহু' বলা যাবে কি?

-রফীকুল ইসলাম
আলীপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : ছালাতে সালাম ফিরানোর সময় শুধু ডান দিকে 'ওয়া বারাক্বা-তুহু' যোগ করা যাবে *(তামামুল মিন্নাহ, পৃঃ ১৭১)*। উল্লেখ্য যে, বলূগুল মারামে (হা/৩১৬) আবুদাঊদের উদ্ধৃতি দিয়ে দুই দিকেই বলার কথা এসেছে। কিন্তু মূল আবুদাঊদে (হা/৯৯৭) এটা নেই। আরো উল্লেখ্য যে, তা ইবনু খুযায়মাতে উক্ত মর্মে যে বর্ণনা এসেছে তার সনদ মুনকার। কেননা আবু ইসহাক্ব নামক রাবী মুদাল্লিস ও দুর্বল *(ইবনু খুযায়মাহ হা/৭২৮ টীকা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩১৩) : কোন পিতা বা অভিভাবক সাবালিকা মেয়ের মতামতের বাইরে বিবাহ দিতে পারেন কি?

-মফীযুদ্দীন
কাশেম বাজার, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : পিতা বা কোন অভিভাবক সাবালিকা মেয়ের মতামত ছাড়া বিয়ে দিতে পারেন না *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/৯২২; বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৮)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩১৪) : অধিকাংশ মা ছোট ছেলেমেয়েদের কপালের এক পার্শ্বে কাজলের ফোটা দেয়। এর কোন উদ্দেশ্য আছে কি?

-ওয়াহীদুযযামান
পাঁচদোনা, নরসিংদী।

উত্তর : ছোট ছেলে মেয়েদের কপালে কোন এক পার্শ্বে কাজলের বা অন্য কোন জিনিষের ফোটা দেয়ার কারণ

সাধারণত দু'টো হতে পারে। (ক) বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ যা মুসলমানের জন্য পরিত্যাজ্য *(আহমাদ, আবূদাঊদ হা/৪৩৪৭)*। (খ) কোন বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যা শিরক।

প্রশ্ন (৩৫/৩১৫) : মিথ্যা মামলায় কেউ কারাগারে গিয়ে মারা গেলে শহীদের মর্যাদা পাবে কি? তিনি কি ৭০ জনকে জান্নাতে নিয়ে যেতে পারবেন?

- সালমান ফারেসী
রংপুর।

উত্তর : উক্ত ব্যক্তি শহীদের মর্যাদা পাবেন না। তবে অবশ্যই তিনি উত্তম প্রতিদান পাবেন। কিন্তু তিনি যদি আল্লাহর পথে সংগ্রাম করতে গিয়ে কারারুদ্ধ হন এবং নির্যাতন করে বা অন্যায় বিচারে তাকে হত্যা করা হয়, তবে তিনি প্রকৃত শহীদের মর্যাদা পাবেন।

উল্লেখ্য যে, শহীদ ফী সাবীলিল্লাহ ছাড়া আরো ৭ শ্রেণীর মানুষ শাহাদত লাভ করবেন বলে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে সেখানে কারারুদ্ধ ব্যক্তির কথা নেই। তাছাড়া আল্লাহ্র রাস্তায় সংগ্রাম করতে গিয়ে জিহাদের ময়দানে যিনি শহীদ হন তিনিই কেবল তার পরিবারের ৭০ জন (ঈমানদার) ব্যক্তিকে জান্নাতে নেবার জন্য সুফারিশ করবেন এবং তা কবুল করা হবে' *(আবুদাঊদ হা/২৫২২)*। ছাহেবে 'আওন বলেন, এর অর্থ তার পরিবারের মূল ও শাখা থেকে ৭০ জন ব্যক্তি। মানাবী বলেন, এখানে ৭০ দ্বারা অসংখ্য বুঝানো হয়েছে, সীমিত সংখ্যা নয় *(আওনুল মা'বূদ হা/২৫০৫-এর ব্যাখ্য দ্রঃ, ৭/১৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩১৬) : ওযূ করার পর সূরা ক্বদর পড়ার কোন ছহীহ হাদীছ আছে কি?

-আব্দুর রহমান
উল্লাপাড়া, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : সূরা ক্বদর পড়া সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে তা জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/১৪৪৯)*। ওযূ করার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' এবং শেষে 'আশহাদু আল্লা ইলা-হা .. .. ছাড়া আর অন্য কিছু বলা যাবে না *(মুসলিম, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৮৯)*।

প্রশ্ন (৩৭/২৭৭) : যে ব্যক্তি রোযাদারকে পানি পান করাবে তাকে আল্লাহ হাউয কাওছারের পানি পান করাবেন' এবং 'যে ব্যক্তি রোযাদারকে ইফতার করাবে আল্লাহ তার গুনাহ সমূহ মাফ করে দিবেন আর জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন'। উক্ত হাদীছদ্বয়ের সনদ সম্পর্কে জানতে চাই।

-রুবেল
সগুনিয়া, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : রোযাদার কে পানি পান করালে আল্লাহ তা'আলা গুনাহ মাফ করেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করেন মর্মে হাদীছটি ইমাম বায়হাক্বী বর্ণনা করেছেন। তবে হাদীছটি যঈফ *(মিশকাত হা/১৯৬৫; সিলসিলা যঈফা হা/৮৭১)*। কিন্তু রোযাদারকে পানি পান করালে হাউয কাওছারের পানি পান করাবেন মর্মে কোন দলীল পাওয়া যায়না ।

প্রশ্ন (৩৮/২৭৮) : কোন মেয়ের পাঁচ কিংবা ছয়বার মাসিক হ'লে তাকে বিবাহ দেওয়া ফরয হয়ে যায়। এই বক্তব্য কি সঠিক?

- মাহফূয
চকশিবরামপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সমাজে যত কুসংস্কার চালু আছে, এটি তার অন্যতম। এগুলো থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

প্রশ্ন (৩৯/২৭৯) : মসজিদে প্রথম জামা'আত হয়ে গেলে পরের মুছল্লীরা জামা'আত করে ছালাত আদায় করতে পারবে কি? এই জামা'আতের সময় এক্বামত দেওয়া যাবে কি?

-মুয়াযযেম
সিংগাপুর।

উত্তর : জামা'আতের পরে আসা মুছল্লীরা এক্বামত দিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করতে পারবে। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার জনৈক মুছল্লীকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখে বলেন, কে আছ এই ব্যক্তিকে ছাদাক্বা দিতে পারে, অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করতে পারে? *(আবুদাঊদ হা/৫৭৪ 'এক মসজিদে দু'বার জামা'আত করা' অনুচ্ছেদ-৫৬; মিশকাত হা/১১৪৬)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, একজনের সাথে আরেকজন ছালাত আদায় করা অধিক উত্তম একাকী ছালাত আদায়ের চাইতে এবং এক জনের সাথে দু'জন ছালাত আদায় করা আরও উত্তম। এভাবে মুছল্লী সংখ্যা যত বেশী হবে, ততই তা আল্লাহ্র নিকটে প্রিয়তর হবে' *(আবু দাঊদ হা/৫৫৪ 'জামা'আতে ছালাতের ফযীলত' অনুচ্ছেদ-৪৮)*। এই সময় এক্বামত দিয়ে জামা'আত শুরু করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৪)*।

প্রশ্ন (৪০/২৮০) : আহাদনামা ও সাত সালাম নামে কোন আমল আছে কি? রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরআনের সাতটি হা-মীম পড়বে তার জন্য জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। এ সম্পর্কে ছহীহ দলীল জানাতে চাই।

-আখতার
বৃ-কুষ্টিয়া, বগুড়া।

উত্তর : প্রশ্নে উল্লিখিত বক্তব্য বানাওয়াট। উক্ত মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। সূরা হা-মীম সাজদাহর ফযীলত সম্পর্কে যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে সবই যঈফ ও জাল *(সিলসিলা যঈফাহ হা/৫১১২; যঈফ তিরমিযী হা/২৮৭৯, ২৮৮৮, ২৮৮৯; মিশকাত হা/২১৪৪, ৪৯, ৫০)*।